নববর্ষ সংখ্যা

এপ্রিল ২০১৭ ■ চৈত্র ১৪২৩-বৈশাখ ১৪২৪

সচিত্র বাংলাদেশ

বাংলা নববর্ষ : ১৪২৪

পয়লা বৈশাখ : বাঙালির প্রাণের উৎসব

মুজিবনগর দিবস ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ

সচিত্র বাংলাদেশ

পড়ুন ও লেখা পাঠান

লেখা সিডি অথবা
ই-মেইলে পাঠাতে হবে
email : dfpsb@yahoo.com

- গ্রাহকগণ পত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করবেন।
- বছরের যেকোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া চলে। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি. যোগে পাঠানো হয়, এ জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% টাকা হারে দেওয়া হয়।
- এজেন্ট, গ্রাহক নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

এপ্রিল ২০১৭ ❑ চৈত্র ১৪২৩ - বৈশাখ ১৪২৪

স্বাগত ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

বাংলা নববর্ষ আমাদের একান্ত নিজস্ব উৎসব, প্রাণের উৎসব। বাঙালির চিরায়ত সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যে বাংলা নববর্ষের প্রভাব প্রবল ও জীবন্ত। পয়লা বৈশাখের বর্ষবরণ উৎসবে প্রাণের স্পন্দন, আবেগের উত্তাপ বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইতোমধ্যে ইউনিসেফ নববর্ষের মঙ্গল শোভাযাত্রাকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলা নববর্ষের সকল আয়োজন এবার তাই আরো বেশি উৎসবমুখর। বাঙালির প্রাণের ছোঁয়া ও নিবিড় মমতায় লালিত শত বছরের ঐতিহ্যময় দিনটি জাতীয় উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। স্বাগত ১৪২৪ বঙ্গাব্দ। এবারের *সচিত্র বাংলাদেশ*-এ নববর্ষ ও বর্ষবরণ নিয়ে নিবন্ধ রয়েছে।

১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর দিবস। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার আলোকে একাত্তর সালের ১০ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় গঠিত বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ১৭ই এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা জাতি সব সময় শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। এ নিয়ে এ সংখ্যায় বিশেষ নিবন্ধ রয়েছে।

এছাড়া ২রা এপ্রিল বিশ্ব অটিজম দিবস, ৩রা এপ্রিল জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ও ৭ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে পালিত হয়। এ সকল দিবস উপলক্ষে নিবন্ধ রয়েছে এবারের সংখ্যায়। এছাড়া থাকছে গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও বিষয়ভিত্তিক প্রতিবেদনসহ অন্যান্য নিয়মিত আয়োজন।

আশা করছি, পাঠকের কাছে সংখ্যাটি সমাদৃত হবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
সুফিয়া বেগম

সহকারী শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

প্রচ্ছদ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ০২-৯৩৩৩১২০, ০২-৪৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক)
E-mail : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

বিক্রয় ও বিতরণ শাখা থেকে নগদ মূল্যে প্রতিটি সংখ্যা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া ষান্মাসিক ১৫০ টাকা ও বাৎসরিক ৩০০ টাকা পরিশোধ করে গ্রাহক হওয়া যায়।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র

পয়লা বৈশাখ : বাঙালির প্রাণের উৎসব ৪
শামসুজ্জামান শামস

মুজিবনগর দিবস ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ৭
খালেক বিন জয়েনউদদীন

মোহাম্মদ সা.-এর মদিনা যাত্রা এবং বাংলা সন ১০
ড. মুহাম্মদ হাননান

মুজিবনগর কেন অনিবার্য ছিল ১২
রফিকুর রশীদ

শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ১৫
সম্পাদনা বিভাগ

বাংলাদেশের বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় পাখি ২০
শরীফ খান

দেশে দেশে নববর্ষ উদ্‌যাপন ২৩
সুলতানা বেগম

পয়লা বৈশাখ ও ইলিশ ২৫
কাজী নুসরাত সুলতানা

ঢাকার বাগ-বাগিচা-বাগান ২৬
বরুণ দাস

২রা এপ্রিল : বিশ্ব অটিজম দিবস
বাংলাদেশে অটিজম সমস্যা ৩০
পারভীন আক্তার লাভলী

৭ই এপ্রিল : বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস
সুস্থ মানবসম্পদ তৈরিতে সুষম খাদ্য ৩২
মো: আজগর আলী

জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ ফলমূল ৩৪
সম্পাদনা বিভাগ

হাইটেক পার্ক : সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত ৩৫
ফজলে রাব্বি খান

অগ্নি দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প ও বজ্রপাতে করণীয় ৩৭
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন

গল্প
রমণী–ঘরনি–জননীর মন ৪০
মিনা মাশরাফী

ধারাবাহিক উপন্যাস

ভ্রষ্ট বিলাস ৪২
সাগরিকা নাসরিন

কবিতাগুচ্ছ

৪৫-৪৭

জাফরুল আহসান, সোহরাব পাশা, আমিরুল হক, শাফিকুর রাহী, নুরুল ইসলাম বাবুল, ফয়সাল শাহ, ম. মীজানুর রহমান, জাকির হোসেন চৌধুরী, নাহার আহমেদ, নির্মল চক্রবর্তী, ফারিহা রেজা, মনিকাঞ্চন ঘোষ প্রজীৎ, সামসুন্নাহার ফারুক, পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী, রুহুল গনি জ্যোতি।

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৮
প্রধানমন্ত্রী ৪৮
তথ্যমন্ত্রী ৫০
আমাদের স্বাধীনতা ৫০
জাতীয় ঘটনা ৫১
উন্নয়ন ৫২
আন্তর্জাতিক ৫৩
শিক্ষা ৫৪
প্রতিবন্ধী ৫৪
স্বাস্থ্যকথা ৫৫
সংস্কৃতি ৫৫
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৬
কৃষি ৫৬
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৫৭
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৫৮
ইতিহাস ও ঐতিহ্য ৫৮
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৯
জেন্ডার ও নারী ৬০
সামাজিক নিরাপত্তা ৬১
যোগাযোগ ৬১
নিরাপদ সড়ক ৬১
শিল্প-বাণিজ্য ৬২
পর্যটন ৬২
চলচ্চিত্র ৬৩
ক্রীড়া ৬৪

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩১৭৩৮৪

মুজিবনগর দিবস ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

উনিশশ একাত্তর সালের ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার তৎকালীন চুয়াডাঙ্গা মহকুমার মেহেরপুরের অদূরে বৈদ্যনাথতলার ভবেরপাড়া আমবাগানে প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিক শপথ নেয় এবং ১০ই এপ্রিল গঠিত এই সরকার ও সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে। এই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাকে অনুমোদন দেওয়া হয়। আমাদের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব ও অবদান অমলিন। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা ৭।

শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এই রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্তি, শিক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিক নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল সেবা, সবার জন্য বিদ্যুৎ, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বিকাশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্ভাবনী, জনবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ১০টি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা ১৫।

মোহাম্মদ সা.-এর মদিনা যাত্রা এবং বাংলা সন

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে সম্রাট আকবর শক্ সনের সূর্যমুখী বর্ষসাল অনুকরণে 'তারিখ-ইলাহি' নামে একটি ক্যালেন্ডার চালু করেন। কিন্তু ক্যালেন্ডারটির বছরের হিসাব শুরু হলো ৯৬৩ হিজরি থেকে। বাঙালি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই এই সমন্বয়মুখী বাংলা সন আজকেও মানেন। স্থানীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, দিনক্ষণগুলো হজরত মোহাম্মদ সা.-এর মক্কা থেকে মদিনা যাত্রার স্মৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা ১০।

বাংলাদেশের বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় পাখি

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতে পাকিস্তান হানাদারবাহিনী যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে হামলে পড়েছিল– চালিয়েছিল হত্যাযজ্ঞ, তখন টানা নয় বছর ধরে চারুকলায় বসবাসকারী একটি 'মুক্ত পোষা' হাড়গিলা পাখিও নিহত হয়েছিল। আজ হাড়গিলা বাংলাদেশ থেকেই বিলুপ্ত। প্রকৃতির নিয়মে কোনো কোনো পাখি হারিয়ে গেছে বা যাচ্ছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিষয়টি পুরোপুরিই মনুষ্য সৃষ্ট। এর ওপরে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখুন, পৃষ্ঠা ২০।

দেশে দেশে নববর্ষ উদ্‌যাপন

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে উদ্‌যাপিত হয় নববর্ষ। থাইল্যান্ডে ১৩-১৫ই এপ্রিল 'সংক্রান' নামে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। এ সময় তারা একে অন্যের গায়ে পানি ছিটিয়ে 'পানি উৎসব' পালন করে এবং পানি ছিটানোর মাধ্যমে বিশুদ্ধ হতে চায়। এভাবে বিভিন্ন দেশে নিজস্ব সংস্কৃতি, জনগণের অনুভূতি, আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বরণ করে নববর্ষকে। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা ২৩।

পয়লা বৈশাখ বাঙালির প্রাণের উৎসব

শামসুজ্জামান শামস

বাঙালির মনে বিপুল সম্ভাবনার আলো জ্বালাতে আবারো এসেছে বৈশাখ। পয়লা বৈশাখ– একটি নতুন বছরের সূচনা। প্রতিটি মানুষের প্রত্যাশা নতুন বছর যেন বয়ে আনে শুভ্রতা, মঙ্গল বারতা। প্রতিবছরই আমরা দুবার নতুন বছরকে উদ্‌যাপন করি দুভাবে। ইংরেজি মাস আমাদের নানা কাজের মাসের হিসাব। শিশুদের স্কুলে নতুন ক্লাস, দেয়ালে নতুন ক্যালেন্ডার, বাড়িওয়ালা ভাড়া বাড়াবে কী বাড়াবে না–এ নিয়ে মনের মাঝে দোলাচল। এসবের হিসাব-নিকাশ করতে করতেই স্বাগত নতুন বছরকে। কিন্তু পয়লা বৈশাখ ভিন্ন দ্যোতনা নিয়ে আসে। নতুন বছরকে বরণ করে নিতে তীব্র আবেগ কাজ করে সবার মনে। এদেশের বাঙালিদের কাছে পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন আত্মপরিচয় সন্ধানের নাম। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হলেও ঢাকায় পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন শুরু হয়েছিল বাঙালি সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন হয়ে উঠেছিল একটি আন্দোলন। ছায়ানট যার কাণ্ডারি।

বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ বাংলাদেশ। প্রতি মাসেই কোনো না কোনো উৎসব হয়ে থাকে। বৈশাখ মাস তার ব্যতিক্রম নয়। আর পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন করে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই। পয়লা বৈশাখ বাঙালি ঐতিহ্যের অহংকার। রমনার অশ্বত্থমূলে (বটমূল নয়) দিনটির সূচনা হয় যথারীতি দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছরের ঐতিহ্য অনুসারে ছায়ানটের বর্ষবরণ সংগীত আয়োজনের মধ্য দিয়ে। যথারীতি রমনামুখী লাখো মানুষের ঢল উৎসবকে করে তোলে আরো বর্ণিল। চৈত্রের শেষ দিনে গ্রাম ও শহরে ব্যবসায়ীরা গত বছরের বিকিকিনির হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দিয়ে বৈশাখের প্রথম দিনে খুলবেন হালখাতা। রাজধানীসহ সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে দিনটি উপলক্ষে বসে বৈশাখি মেলা। পটুয়া আর মৃৎশিল্পীরা মেলায় তুলে ধরেন তাদের সৃজনসম্ভার। নাগরদোলায় চড়া আর খেলনা, পুতুল, বাঁশিসহ বৈশাখি মেলার রকমারি পণ্য কেনার দুর্নিবার আকর্ষণে ছেলে-বুড়ো সবাই ছোটে মেলায়। রমনার অশ্বত্থমূলে ১৯৬৭ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার নব-উন্মেষকালে ছায়ানট সেই যে কাকডাকা ভোরে রবীন্দ্রনাথের নববর্ষ বরণের আবাহনী গান গেয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, সেটি আজ রাজধানীবাসীর সবচেয়ে বড়ো উৎসবের কেন্দ্র। রমনা এখন নববর্ষে লোকারণ্য। সমগ্র রাজধানীর পথ মিশে যায় রমনায় এসে। ইদানীং পান্তা-ইলিশ পয়লা বৈশাখের উৎসবের প্রধান অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। এ নিয়ে এখন শহুরে নব্য ধনিক ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের মাতামাতির শেষ নেই। ফলে পয়লা বৈশাখের দিন এখন শহরের অলিগলি, রাজপথ, পার্ক, রেস্তোরাঁ সর্বত্রই বিক্রি হয় পান্তা-ইলিশ। অভিজাত হোটেলগুলোতেও বাহারি বিদেশি খাবারের পাশাপাশি থাকে পান্তা-ইলিশের ব্যবস্থা। তবে এই পান্তা-ইলিশ খাওয়া এখন একশ্রেণির মানুষের বিলাসিতায় পরিণত হয়েছে।

পয়লা বৈশাখ পুরনো জরাজীর্ণকে ঝেড়ে ফেলে আমাদের যাপিত জীবনে নতুন সম্ভাবনা ও নতুন প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলতেই শুধু নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে একাকার হওয়ার প্রেরণাও যোগায়। তাই পয়লা বৈশাখই হচ্ছে বাঙালির জীবনে সবচেয়ে বড়ো অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উৎসব। বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস হাজার বছরের। সমৃদ্ধ এই সংস্কৃতির সঙ্গে বর্ষবরণ উৎসব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পয়লা বৈশাখ বাঙালি ঐতিহ্যের অহংকার। 'ওই নতুনের কেতন ওড়ে কালবোশেখি ঝড়, তোরা সব জয়ধ্বনি কর'– কবির এ বাণী হৃদয়ে ধারণ করে, পুরনো জরা ও গ্লানি ঝেড়ে ফেলে বাঙালি নতুন বছরকে বরণ করে নেয়। পুরাতন বছরের জরা, ক্লান্তি, গ্লানিকে পেছনে ফেলে চির নতুনের আহ্বান নিয়ে বছর ঘুরে আসে পয়লা বৈশাখ। রাজধানীর রমনা অশ্বত্থমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনব্যাপী বাংলা নববর্ষের উৎসব। ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণি-পেশা, বয়স-নির্বিশেষে সব মানুষ শামিল হন বৈশাখি উৎসবে। বাংলা নববর্ষে

দেশজুড়ে নানা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। দোকানিরা সারাবছরের হিসাব মিলিয়ে খোলেন হালখাতা। বিভিন্ন স্থানে বসে বৈশাখি মেলা। বর্তমানে এ উৎসব হয়ে উঠেছে কিছুটা শহরকেন্দ্রিক। অথচ গ্রামই এদেশের প্রাণ। গ্রামের মানুষ, মূলত কৃষকরাই বাংলা দিনপঞ্জি অনুসরণ করে থাকেন। বাংলা ঋতুচক্র মেনে করেন চাষাবাদ। পয়লা বৈশাখ তাদের জীবনে যেন আনন্দ ও বিনোদনের বার্তা নিয়ে আসে।

পৃথিবীর অনেক জাতির নিজস্ব কোনো নববর্ষ নেই। এই দিক দিয়ে আমরা সৌভাগ্যবান। আসলে বাংলা সনের উৎপত্তি হয়েছে এই দেশের মানুষের জীবনধারা এবং প্রকৃতির বিচিত্রতার নিরিখে। প্রধানত ফসলের মৌসুম চিহ্নিতকরণ ও খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে মোগল শাসনামলে বাংলা পঞ্জিকার প্রবর্তন করা হলেও তা এখন মিশে গিয়েছে সমগ্র জাতির অস্থিমজ্জায়। চৈত্রে রবিশস্য, বৈশাখে বোরো ধান, জ্যৈষ্ঠে পাকা আম-কাঁঠাল, আষাঢ়-শ্রাবণে ঘনঘোর বরিষা ও নদী জল ছল ছল, শরতে কাশবনে বাতাসের দোলা, অঘ্রাণে নবান্নের উৎসব, পৌষে পিঠাপুলির ধুম, মাঘে কনকনে শীত–এসবই আমাদের লোকায়ত জীবনধারার অতি পরিচিত অনুষঙ্গ। প্রকৃতিতে বৈশাখ আসে কালবৈশাখির আশঙ্কা সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু বাঙালি জীবনে বৈশাখ আসে জীবনসংগ্রামের অফুরান প্রেরণা সঞ্চারিত করে।

নববর্ষের বৈসাবি উৎসবে পানিতে ফুল ভাসিয়ে দিচ্ছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মেয়েরা

জাতি, ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই নয়, পৃথিবীর যেখানেই বাঙালি ও বাংলা ভাষাভাষী মানুষ রয়েছে সবাই পয়লা বৈশাখে বর্ণাঢ্য উৎসবের আয়োজন করে থাকেন। রাজধানীসহ সারাদেশের মানুষ বাংলা গান, কবিতা, শোভাযাত্রা, নাচসহ নানান আয়োজনে দিনটিকে উদ্‌যাপন করে থাকেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণ 'বৈসাবী' উৎসব পালন করে। বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকা এদিনে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। এছাড়াও সকল সরকারি-বেসরকারি টিভি ও রেডিও স্ব স্ব উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করে থাকে। এছাড়া বিভাগীয় শহর, ঢাকা মহানগর, দেশের সব জেলা ও উপজেলায় পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন উপলক্ষে নানা বর্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ও গ্রামীণ লোকজ মেলার আয়োজন করা হয়।

বৈশাখি মেলায় নাগরদোলায় শিশুরা

বর্ষবরণ উৎসব কবে থেকে কীভাবে শুরু হয়েছে তা নিয়ে বিভিন্ন মত এবং ঘটনা জানা যায়। এর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি ধারণা হলো মোগল সম্রাট আকবর প্রথম বঙ্গাব্দের প্রচলন করেন। সম্রাট আকবরের সময় রাজকার্যে সেই সময় হিজরি সনের প্রচলন ছিল। ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরও হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে কৃষিপণ্যের খাজনা আদায় করা হতো। হিজরি সন চাঁদের ওপর নির্ভরশীল থাকায় তা কৃষি ফলনের সঙ্গে মিলত না। যার ফলে অসময়ে কৃষকদেরকে খাজনা পরিশোধ করতে বাধ্য করা হতো। সুষ্ঠুভাবে খাজনা আদায়ের লক্ষ্যেই মোগল সম্রাট আকবর সেই সময় 'তারিখ-ইলাহি' সনের প্রচলন করেন। সম্রাটের আদেশ অনুযায়ী জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ফতেহ উল্লাহ সিরাজি সৌর সন এবং আরবি হিজরি সনের ওপর ভিত্তি করে নতুন সনের নিয়ম নির্মাণ করেন। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই মার্চ বা ১১ই মার্চ থেকে নতুন সন গণনা শুরু হয়। ইলাহি সন হলেও প্রথমে এই সনের নাম ছিল ফসলি সন। পরে এটি 'বঙ্গাব্দ' বা 'বাংলা বর্ষ' নামে পরিচিত হয়। সম্রাট আকবরের সিংহাসন আরোহন ১৫৫৬ সালে, হিজরি সন ছিল ৯৬৩। বাংলা সনও তখন ৯৬৩ থেকে যাত্রা শুরু করে। বঙ্গাব্দ শুরু হলেও এখন যেভাবে সপ্তাহের সাতটি দিন প্রচলিত তখন তেমনটি ছিল না। সম্রাট আকবরের সময় মাসের প্রত্যেকটি দিনের জন্য পৃথক নাম ছিল। পরবর্তীতে সম্রাট শাহজাহান একজন বিদেশি পণ্ডিতের সাহায্য নিয়ে সাপ্তাহিক পদ্ধতিতে দিনের নামকরণ পদ্ধতির প্রচলন করেন। আবার বিভিন্ন নক্ষত্রের নাম থেকে বাংলা সনের মাসগুলোর নামকরণ করা হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, বিশাখা থেকে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা থেকে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়া থেকে আষাঢ়, শ্রবণা থেকে শ্রাবণ, ভাদ্রপাদ থেকে ভাদ্র, অশ্বিনী থেকে আশ্বিন, কৃত্তিকা থেকে কার্তিক, অগ্রাইহন থেকে অগ্রহায়ণ, পুষ্য থেকে পৌষ, মঘা থেকে মাঘ, ফল্গুনি থেকে ফাল্গুন এবং চিত্রা থেকে চৈত্র মাসের নামকরণ হয়েছে। বঙ্গাব্দের সঙ্গে খ্রিষ্টীয় সনের দিন-তারিখের পার্থক্যের কারণে সাধারণ মানুষের পক্ষে উভয় সন গণনায় সমস্যা হতো। এজন্য ১৯৬৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে বঙ্গাব্দ সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৪ই এপ্রিলকে স্থায়ীভাবে বাংলা নববর্ষ শুরুর দিন হিসেবে ঠিক করা হয়।

দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে মেলা হয়ে থাকে। দীর্ঘকাল ধরেই মেলার প্রবর্তন লক্ষ করা যায়। বৈশাখি মেলা সাধারণত দু'দিনব্যাপী হয়ে থাকে। কোথাও কোথাও এর স্থায়িত্ব আরো বেশি হয়ে থাকে। চৈত্র মাসের শেষ দিনে চৈত্র সংক্রান্তির মেলা। আর বৈশাখের প্রথম দিনে বসে বৈশাখি মেলা।

অতীতে মেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হতো কবিগান, জারিগান, পালা গান, বাউল গান, পুতুলনাচ, যাত্রা, গাজীর পটসহ অন্যান্য গান। বিনোদনের জন্য আরো থাকত বায়োস্কোপ, নাগরদোলা, কুস্তি, কাবাডি, ঘুড়ি ওড়ানো ও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা, ষাঁড়ের লড়াই ও মোরগের লড়াই। এর কিছু কিছু এখনো টিকে আছে। মেলা উপলক্ষে যেসব খাবার, খেলনা ও কারুপণ্য তৈরি হয় তা আমাদের কৃষ্টির অন্যতম উপাদান। অতীতে বিভিন্ন স্থানে বৈশাখি মেলায় কাঠের আসবাবপত্র, কৃষিপণ্য, কৃষি উপকরণ ও বীজ পাওয়া যেত। এখন এগুলো তেমন দেখা যায় না। মৃৎ ও কুটির শিল্পজাত বিভিন্ন পণ্যে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। অনেক ক্ষেত্রে মেলা আয়োজনেও এসেছে নতুনত্ব।

নববর্ষের মঙ্গল শোভাযাত্রায় ঐতিহ্যবাহী পালকি ও বেহারা

বাংলা ও বাঙালির লোকজ সংস্কৃতির মূল বিষয়টি হলো, উৎসবের মধ্য দিয়ে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। সেই উৎসবের মধ্যদিয়েই প্রকাশ পায় বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, কৃষ্টি ও গৌরব। বিগত বছরের সব অপূর্ণতা, গ্লানি, ব্যর্থতা মুছে ফেলে জীবনকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার আশায় বাঙালি উদ্‌যাপন করে তার একান্ত আপন নতুন বর্ষ। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে যদিও এখন গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জিরই শরণাপন্ন হতে হয়, তবু বাংলা বর্ষপঞ্জির অনুসরণ একেবারে বিলুপ্ত হয়নি বাঙালির জীবন থেকে। কৃষিনির্ভর এই দেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষ চাষাবাদ, ঋতু পরিক্রমা অনুসরণ, নানা তিথি-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান পালনের দিনক্ষণ নির্ধারণ– এমন নানা বাস্তব প্রয়োজনে বাংলা বর্ষপঞ্জিই অনুসরণ করে। তবে এসব দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডকে ছাপিয়ে উৎসবের আয়োজনে বাঙালির নিজস্ব বর্ষ বিশেষ অগ্রাধিকার পেয়েছে। পয়লা বৈশাখ পরিণত হয়েছে বাঙালির জীবনে সর্ববৃহৎ উৎসবে। সংস্কার, মতাদর্শের মতো সীমাবদ্ধতাগুলো অতিক্রম করে বৈশাখি উৎসব আজ বাংলা ভাষাভাষী সব মানুষের হৃদয়াবেগ থেকে উৎসারিত এক অতুলনীয় মহোৎসবে পরিণত হয়েছে। বাঙালি চেতনা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রবহমান ধারা হচ্ছে বাংলা নববর্ষ ও বৈশাখি মেলা।

গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচ

বৈশাখি মেলা কেনাকাটা ও চিত্তবিনোদনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক দিক থেকেও মেলার গুরুত্ব রয়েছে। বাংলা নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ মানেই হলো চারুকলার মঙ্গল শোভাযাত্রা। এটি শুরু হয় সকাল নয়টার মধ্যে। গত বছর জাতিসংঘের ইউনিসেফ এ মঙ্গল শোভাযাত্রাকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আর ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান শুরু হয় বছরের নতুন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। দিনব্যাপী পুরো রমনা উদ্যান, শাহবাগ আর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় চলে আরো নানা আয়োজন। ঢাকার ধানমন্ডিতে রবীন্দ্রসরোবর মঞ্চকে ঘিরেই এখন আমাদের অনেক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। বাংলা নববর্ষে রবীন্দ্রসরোবর মঞ্চসহ পুরো ধানমন্ডি লেক তথা ধানমন্ডি এলাকা পরিণত হয় জনসমুদ্রে। এখানেও দিনভর চলে নানান অনুষ্ঠান আর মেলা। বৈশাখি মেলার প্রচলন গ্রাম থেকে শুরু হলেও এর আয়োজন এবং এতে অংশগ্রহণের ব্যাপ্তি এখন নাগরিক সমাজের মধ্যেই অধিকতর প্রবল। তাই বলে গ্রামীণ পরিমণ্ডল থেকে তা পুরোপুরি হারিয়ে গেছে, এমনটিও বলা যাবে না। তবে বৈশিষ্ট্যগতভাবে গ্রামীণ বৈশাখি মেলা এখন যতটা না লোকজ উৎসব, তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়িক উপলক্ষ। অবশ্য ইতিবাচকভাবে দেখলে এটাও বলা যায়, বৈশাখি মেলার সঙ্গে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যুক্ত হওয়ার ফলে এর জৌলুসই শুধু বাড়েনি, ক্রমশ এর ব্যাপ্তিও সম্প্রসারিত হচ্ছে। ধারণা করা চলে, তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের দৈনন্দিন গৃহস্থালির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত এসব অর্থনৈতিক অনুষঙ্গের কারণেই হয়ত বৈশাখি মেলা দিনে দিনে আরো শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে এবং সর্বজনীনতার আরো উচ্চতর মাত্রা অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে।

লেখক: সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

মুজিবনগর দিবস ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

খালেক বিন জয়েনউদদীন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে ৭ই মার্চ, ২৬শে মার্চ ও ১৬ই ডিসেম্বরের মতো ১৭ই এপ্রিল একটি অবিস্মরণীয় দিন। উনিশশ একাত্তর সালের এদিন কুষ্টিয়া জেলার তৎকালীন চুয়াডাঙ্গা মহকুমার মেহেরপুরের অদূরে বৈদ্যনাথতলার ভবেরপাড়া আমবাগানে প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিক শপথ নেয় এবং ১০ই এপ্রিল গঠিত সরকার ও সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে। মেহেরপুরের ভবেরপাড়ার ঐ স্থানটি সেদিন থেকেই 'মুজিবনগর' নামে পরিচিতি লাভ করে এবং যুদ্ধকালীন সরকার মুজিবনগর নামেই সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। এই সরকারের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যেই আমরা প্রতিবছর ১৭ই এপ্রিল 'মুজিবনগর দিবস' হিসেবে পালন করি।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু একদিনে সংগঠিত হয়নি। এই জনপদের মানুষ চিরকালই বঞ্চিত-লাঞ্ছিত ছিল। স্বাধিকার ছিল না বাঙালির। গুপ্ত, পাল, সেন, সুলতানি, মোগল, কোম্পানি ও ইংরেজ আমলে নির্যাতিত হয়েছে সাধারণ মানুষ। ১৯৪৭ সালে আমাদের বাপ-দাদারা একবার স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন। সেই স্বাধীনতার স্বাদ ছিল বিস্বাদে ভরা। আমাদের পূর্ববাংলা পাকিস্তানের উপনিবেশ হলো। ভাষা কেড়ে নিতে চাইল। সে-কি বৈষম্য! সর্বক্ষেত্রে বাঙালি অধিকারহারা। ফরিদপুরের তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার এক গ্রামের যুবক অসীম সাহসে অধিকারহারা মানুষের স্বাধিকারের পথ বাতলালেন এবং শাসকদের কাছে ন্যায্য ও উচিত দাবি তুললেন। তারা বলল– ঐ দাবিগুলো নাকি পাকিস্তান ভাঙার। অগত্যা তাঁকেই ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানো হলো। এরপর বাঙালির জাগরণ। বাঙালির আরেক নেতা মওলানা ভাসানী তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। জনগণের আন্দোলনে '৬৯-এ গণ-অভ্যুত্থান হলো। সেই যুবক, যাঁর নাম শেখ মুজিব, তিনি ষড়যন্ত্র মামলা থেকে রেহাই পেলেন। অন্যরা মুক্তি পেল, সামরিক শাসক আইয়ুব বিদায় নিলে এল তারই প্রেতাত্মা জেনারেল ইয়াহিয়া। এই লোকটি নির্বাচন দিলেন। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল বাঙালি। কিন্তু শাসন ক্ষমতায় বসতে পারল না বাঙালি। অনেক দেনদরবার হলো। ইয়াহিয়ার আবার ষড়যন্ত্র। বন্দুকের নল দেখিয়ে বাঙালিকে দমনের প্রচেষ্টা।

অবশেষে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে, যার পূর্ব নির্দেশনা ছিল তাঁর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে। স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু আবার পাকি সৈন্যের হাতে বন্দি হলেন। পাকি সৈন্যরাও শুরু করল বাঙালি নিধনযজ্ঞ। তখন বাংলার মানুষ মরিয়া। রুখে দেবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। অবশ্য মার্চের প্রথম থেকেই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশে) প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল। পাকিস্তান সৈন্যদের রুখে দেবার পাশাপাশি '৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা ভারতের সীমান্ত রাজ্য ত্রিপুরার আগরতলায় মিলিত হলেন। তারা বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বাস্তবে রূপ দেবার লক্ষ্যে এবং হানাদার পাকিবাহিনীকে হটানোর জন্য বাংলাদেশ সরকার গঠন করলেন ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করলেন। এই ঘোষণাপত্রের আলোকেই সরকার গঠন, আনুষ্ঠানিক শপথ, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বিজয়-পরবর্তী নির্বাচন ও সংবিধান

প্রণয়ন সম্ভব হয়েছিল। '৭০-এ বিজয়ী সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে প্রণীত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মূলভিত্তি। বাংলাদেশের প্রথম রাজধানীর নাম 'মুজিবনগর'। শপথের দিন মুজিবনগরকে রাজধানী ঘোষণা করা হয়। অবশ্য কাজকর্ম সম্পাদিত হয় কলকাতার আট নম্বর থিয়েটার রোডে। মুজিবনগর সরকারকে কেউ কেউ প্রবাসী সরকারও বলে থাকেন।

আগরতলায় ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ গঠিত সরকার কলকাতায় অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করে। ১৭ই এপ্রিল শপথ অনুষ্ঠানের দিন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ-এর প্রিন্সিপাল এইডএমএনএ ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম (রহমত আলী) ছদ্মনাম নিয়ে প্রেসব্রিফিং করে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের নিয়ে দুপুরের আগে বৈদ্যনাথতলায় পৌঁছান। সরকারের উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ক্যাপটেন এম. মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামান, খোন্দকার মোশতাক, প্রধান সেনাপতি আতাউল গণি ওসমানী, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, মহকুমা প্রশাসক তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী, কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরী, ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার মাহবুবউদ্দিন আহমদ, বিএসএফ-এর কর্নেল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল পবিত্র কালামে পাক তেলাওয়াতের মাধ্যমে। তেলাওয়াত করেন দর্শনা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র মো. বাকের আলী। তেলাওয়াতের পর জাতীয় সংগীত গীত হয়। পরিচয় পর্বের শেষে নেতৃবৃন্দের ভাষণ ও সংবাদ সম্মেলন। সবশেষে মিষ্টি বিতরণ। দু-একদিনের মধ্যেই সমগ্র অঞ্চল ভাগ করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, শরণার্থীদের আশ্রয় এবং পাকি সৈন্যের বাঙালি নিধনযজ্ঞের খবর বিদেশে প্রেরণের জন্য মুজিবনগর সরকার সঠিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম ভারত সরকার, ভারতের জনসাধারণ বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের মানুষ সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। অনেক রক্তক্ষয় ও প্রাণের বিনিময়ে আমরা হানাদারদের পরাস্ত করি ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরে।

প্রতিবছরই আমরা লক্ষ করি স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস কিংবা মুজিবনগর দিবস উদ্‌যাপনকালে আত্মবিসর্জনের ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা বলা হয়। কিন্তু স্বাধীনতার ঘোষণার কথা বলা হয় না। যা বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত হয়েছিল ২৬ শে মার্চ এবং তা ঘোষণাপত্রে সন্নিবেশিত হয় ১৩ পঙ্‌ক্তির পরেই এবং ১৭ই এপ্রিল শপথ অনুষ্ঠানে দীর্ঘ সময় ধরে পাঠ করেন অর্পিত দায়িত্ব পালনকারী এমএনএ অধ্যাপক ইউসুফ আলী। অধ্যাপক ইউসুফ আলী শপথ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হুবহু উপস্থাপন করেন এভাবে:

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

The PROCLAMATION OF INDEPENDENCE MUJIBNAGAR, BANGLADESH Dated 10th day of April, 1971

যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়,

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন,

এবং

যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন,

এবং

যেহেতু এই আহুত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়,

এবং

যেহেতু পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে,

এবং

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই এপ্রিল ২০১৬ ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধু ভবনে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে দলীয় নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন –পিআইডি

যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান,

এবং

যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যের মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের উপর নজীরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংঘটন করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে,

এবং

যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের মধ্যে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে,

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম, এবং পারস্পরিক আলোচনা করিয়া,

এবং

বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে,

সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম,

এবং

এতদ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন

এবং

রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন, ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন,

একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

কর আরোপণ ও অর্থ ব্যয়ন ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

গণপরিষদ আহ্বান ও মূলতবীকরণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

এবং

বাংলাদেশের জগগণকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য করিতে পারিবেন

আমরা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, কোন কারণে রাষ্ট্রপতি না থাকা বা রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়া বা তাঁহার

ঐতিহাসিক মুজিবনগর কমপ্লেক্স, মেহেরপুর

ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির উপর এতদ্বারা অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং তিনি উহা প্রয়োগ ও পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, জাতিমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে আমাদের উপর যে দায় ও দায়িত্ব বর্তাইবে উহা পালন ও বাস্তবায়ন করার এবং জাতিসংঘের সনদ মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, এই দলিল কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আমাদের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিলাম।

সহৃদয় পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন কী উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং কী কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হয়েছে। বলা হয়েছে, এই ঘোষণা সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করে এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে ও পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয়। ঘোষণার শেষ পর্বে রয়েছে সরকারের গঠন প্রক্রিয়া ও কার্যকরের নির্ধারিত তারিখ। ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাকে অনুমোদন দেওয়া হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এই ঘোষণাপত্র আমাদের সংবিধানের অংশ এবং তা সপ্তম তফসিল-১৫০(২) অনুচ্ছেদে সংযোজিত।

মুজিবনগর সরকারের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা, বিশ্বে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি, যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, শরণার্থীদের আশ্রয়-প্রশ্রয়, বিদেশের সঙ্গে দূতিয়ালি এবং যোগ্য নেতৃত্বের কারণেই মুক্তিযুদ্ধ দ্রুত সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়।

আমাদের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব ও অবদান অমলিন। আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি বিপ্লবী সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ক্যাপটেন এম মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামান এবং সকল মুক্তিযোদ্ধা, সরকারের সকল পর্যায়ের অংশীদারদের–যারা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁরা ইতিহাসের সূর্যসন্তান–বাংলা মায়ের কৃতী সন্তান।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক

নিবন্ধ

মোহাম্মদ সা.-এর মদিনা যাত্রা এবং বাংলা সন

ড. মুহাম্মদ হাননান

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ২০১১ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় বিশ্ব বাঙালি সম্মেলনে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এতে তিনি হিজরি সন, বঙ্গাব্দ, শকাব্দ, খ্রিষ্টাব্দ ইত্যাদি বিষয়েও বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি বলেন,

> বাঙালির চিন্তাধারার ঐতিহ্যের মধ্যে... একটি গুণ বাঙালির সভ্যতার গ্রহণশক্তি এবং সমন্বয় প্রীতি। ...আমাদের গ্রহণশক্তির পরিচয় বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ দিয়ে ফল্‌সা করা যায়। তার আরেকটি উদাহরণ বরং দিই। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে সম্রাট আকবর নতুন একটি ক্যালেন্ডার স্থাপিত করার চেষ্টা করেছিলেন– এই প্রচেষ্টার মধ্যে আকবরের সর্ব-সংস্কৃতির সমন্বতা করার প্রচেষ্টা ছিল।
>
> যে বছরে তিনি সিংহাসনে উঠলেন সে বছরটি মুসলিম হিজরি সনে ৯৬৩ এবং হিন্দু শক্ বর্ষপঞ্জিতে ১৪৭৮ (সেটি ইউরোপীয় মতে ১৫৫৬ সাল)। তারিখ-ইলাহি নাম দিয়ে এই ক্যালেন্ডারটি শক্ সনের সূর্যমুখী বর্ষগণ মানল, কিন্তু বছরের হিসাবটি শুরু হলো হিজরি থেকে নেওয়া ৯৬৩ দিয়ে।
>
> এই সমন্বিত ক্যালেন্ডারটি অবিভক্ত ভারতবর্ষের অন্য কোনো অঞ্চলে বেশিদিন চলল না। কিন্তু সেটি নতুনভাবে গ্রহণ করা হলো আমাদের সমন্বয়মুখী বাংলা সন রূপে। এর একটি আশ্চর্য ফল হচ্ছে যে, বাঙালি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই এই সমন্বয়টি আজকেও মানেন। যেমন একজন হিন্দু পূজারি যখন তাঁর কাজে এ বছরের... সনটিকে আহ্বান জানিয়ে শুরু করেন, তখন তাঁর বোধ হয় জানা থাকে না যে, এই পূজা উপলক্ষে তিনি স্মরণ করেছেন মোহাম্মদের মদিনা যাত্রার পবিত্র দিনের কথা। [সূত্র: *মাসিক উত্তরাধিকার*, বাংলা একাডেমি, চৈত্র ১৪১৮ (মুদ্রণ মে ২০১২), পৃষ্ঠা ২২]।

অন্যত্র, অমর্ত্য সেন আরো লিখেছেন,

> তুলনামূলকভাবে অধিক সাফল্য অর্জনকারী বাংলা সন হচ্ছে সমন্বয় সাধনের এক সাহসী প্রচেষ্টার ফল এবং যার উৎস খুঁজে পাওয়া যায় তারিখ-ইলাহির সংহতি প্রচেষ্টার মধ্যে (যা পরোক্ষভাবে আকবরের বহু সংস্কৃতিবাদী দর্শনের সঙ্গেও যুক্ত)। স্থানীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করার সময় কোনো বাঙালি হিন্দু এ-কথা নাও জানতে পারেন যে, হিন্দু পূজা-অর্চনার সঙ্গে সম্পর্কিত দিনক্ষণগুলি হজরত মহম্মদের মক্কা থেকে মদিনা যাত্রার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। [অমর্ত্য সেন: *তর্কপ্রিয় ভারতীয়* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা ৩১৯]।

প্রকৃতপক্ষে, বাংলা সন বা বাংলা সাল, যা-ই বলি না কেন এর সঙ্গে শব্দগত ও ভাবগত ঐক্য রয়েছে ইসলামি ঐতিহ্যের। 'সন' আরবি শব্দ, অর্থ 'বছর', আবার 'বর্ষপঞ্জি'ও। 'সাল' অর্থও 'বছর', ফারসি শব্দ। আমরা যে দিন গণনায় 'তারিখ' শব্দটি ব্যবহার করি, তার শাব্দিক অর্থ 'দিন', আর এটিও আরবি শব্দ। 'বাংলা সন' বিষয়ক একজন গবেষক এ বিষয়কে সামনে রেখে মন্তব্য করেছেন,

> বাংলা সনের জন্ম-ইতিহাস থেকে প্রতিপন্ন হবে যে, আরবী হিজরী সনেরই বিবর্তনে বাংলা সনের জন্ম হয়েছে। প্রসংগত: বলে রাখা প্রয়োজন, বাংলা ও হিজরী সন মূলত: একই সন এবং একই সময়ে (৬২২ খ্রী:), একই উৎস থেকে উৎসারিত। শুধু যে হিজরী সনের সঙ্গে বিশ্বনবীর হিজরতের স্মৃতিবিজড়িত তাই নয়, বাংলা সনের ইতিহাসের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বস্তত: হিজরী সনের একটি শাখা রূপেই বাংলা সনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। [মুহম্মদ আবূ তালিব: *বাংলা সনের জন্মকথা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৭, লেখকের ভূমিকা-পত্র, পৃষ্ঠা এক]।

অমর্ত্য সেনের অভিমতের সঙ্গে গবেষক আবূ তালিবের মন্তব্য ও সিদ্ধান্তের মিল রয়েছে। তবে বাংলা সন প্রবর্তনে সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫) এবং উদ্ভাবনে পণ্ডিত আমির ফতেহ্ উল্লাহ সিরাজীর (মৃত্যু ১৫৮২) নামই বিখ্যাত হয়ে আছে। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে তাঁর নির্দেশে ৯৯২ হিজরিতে অথবা বলা যায়, ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা সন প্রবর্তিত হয়। প্রচলিত হিজরি সনের সঙ্গে মিল রেখে রাজ জ্যোতিষী আমির ফতেহ্ উল্লাহ্ সিরাজী বাংলা সনের জন্ম দেন। তবে সম্রাট আকবর প্রথমেই বাংলা সন তৈরিতে যাননি। তিনি যে 'দ্বীন ইলাহি' নামে নতুন এক মতাদর্শ চালু করার চেষ্টা করেছিলেন, তার পাশাপাশি 'ইলাহি সন' নামে নতুন এক বর্ষপঞ্জিও চালু করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু দুটোই লোকপ্রিয়তা পায়নি।

পরে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রাজকর আদায়ে সুবিধার জন্য অনেকগুলো 'ফসলি সন' চালু করেন। ফসলি সনের মধ্যে বঙ্গদেশে 'বাংলা সন', উড়িষ্যায় 'আমলী সন' মহারাষ্ট্রে 'সুরসন' ইত্যাদি বিভিন্ন সন চালু করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, ফসলের মাধ্যমে রাজকর আদায়ে জনগণকে সহায়তা করা। আকবরের এ পন্থা লোকপ্রিয়তা পায় এবং সারা ভারতে, বিশেষ করে তৎকালীন বঙ্গদেশে এর মাধ্যমে বাংলা সন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এজন্য বঙ্গদেশে বাংলা সনকে একসময় ফসলি সনও বলা হতো। স্বাধীন বাংলাদেশে, পশ্চিমবঙ্গে এবং ত্রিপুরায় এখনো ব্যবসাকেন্দ্রে বাংলা সন 'হালখাতা' নামে পূর্বের 'ফসলিন'-এর ধারণাকেই উজ্জীবিত করে রেখেছে। সম্রাট আকবর বাঙালি ছিলেন না, কিন্তু বঙ্গদেশের (বংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা) জনগণের কাছে এ কারণেই অধিক জনপ্রিয় হয়ে আছেন। আকবরের পরে ভারতের অন্যান্য সম্রাটরাও ফসলি সনের এ ধারাকে অব্যাহত রাখেন। ফলে ধীরে ধীরে বাংলা সন মানুষের লোকসংস্কৃতির অংশ হয়ে দাঁড়ায়, যা আজও অব্যাহত আছে।

আমির ফতেহ্ উল্লাহ্ সিরাজী সম্রাটের নির্দেশে যখন বাংলা সনের ছকটি তৈরি করেন, তখন তিনি একে হিজরি সনের সমান্তরাল ও সমবয়সি করে তোলেন। অর্থাৎ হিজরি ও বাংলা সন দুটোই ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু হয়। এ বছরই রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। গবেষকরা বলছেন,

> যদিও মোহাম্মদ সা. রবিউল আউয়াল মাসের ৪ তারিখে হিজরত করেন, তথাপি হিজরি সন হিজরতের প্রকৃত তারিখ থেকে শুরু হয়নি। হিজরি সনের গণনা শুরু করা হয় মোহররম মাসের প্রথম তারিখ থেকে। তবে বর্ষপঞ্জিটি তৈরি হয় হযরত উমর রা.-এর খেলাফতকালে, অর্থাৎ হিজরতের প্রকৃত ঘটনার ১৭ বছর পর হিজরি সন চালু হয়। [মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা: *চান্দ্র-মাসের ইতিকথা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৩৬]।

এভাবে মোহাম্মদ সা.-এর মদিনা যাত্রার স্মারক হিসেবে হিজরি সন প্রবর্তিত হয়েছিল। যার প্রভাব বাংলা সনেও রয়েছে। অপরদিকে সম্রাট আকবরের সিংহাসনে আরোহণের স্মারক হিসেবে চালু হয়েছিল বাংলা সন। বাংলা সন ঐতিহ্যগতভাবে দুটো বিশেষ ঘটনারই স্মারক হিসেবে চিহ্নিত। দুনিয়ার বর্ষপঞ্জির ইতিহাসে হয়ত বাংলা সনের মতো এমন গৌরব আর কোনো সনেরই নেই। সম্রাট আকবর চেয়েছিলেন, একটি ত্রুটিমুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত সৌর সন। [*আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন মুহম্মদ আবূ তালিব, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৭]। তাঁর প্রবর্তিত ইলাহি সন এটা হয়ে উঠতে পারেনি, যা পেরেছে বাংলা সন। বাংলা সন সম্রাট আকবরের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়ন করেছে। কারণ তা বাংলা অঞ্চলের সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে

উঠেছে। একটি স্বাধীন দেশের এবং একাধিক প্রদেশের সরকারি পঞ্জির স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে এখন। সম্রাট আকবর এতদূর পর্যন্ত হয়ত কল্পনা করতে পারেননি। তবে বাংলা সনের উদ্ভাবক আমির ফতেহ্ উল্লাহ সিরাজী হয়ত এর সফলতা সম্পর্কে খানিকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। আকবরের রাজসভার প্রধান পণ্ডিত আবুল ফজল তাঁর আকবরনামা গ্রন্থে লিখেছেন,

> যদি এমন দুর্ঘটনা কোনোদিন ঘটে যে, দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি বিনষ্ট হয়, আর সিরাজী সাহেব জীবিত থাকেন, তাহলে একা তিনিই তার পুনর্গঠন করতে সক্ষম হবেন। [আবুল ফজল: *আকবরনামা*, দ্বিতীয় খণ্ড, (ইংরেজি অনুবাদ: Tr. Mr. Beveridge), পৃষ্ঠা ২৩, *বাংলা সনের জন্মকথা* গ্রন্থে উদ্ধৃত]।

এই জোতিষশাস্ত্রবিদ ফতেহ্ উল্লাহ সিরাজীর প্রতি সম্রাট আকবরের নির্দেশনা ছিল, 'যেহেতু ভারতে প্রচলিত সনগুলি সৌর পদ্ধতির এবং তার মাসগুলি চান্দ্র পদ্ধতির, তাই আমার নির্দেশ এই যে, প্রস্তাবিত সনটি যেন পূর্ণাঙ্গ সৌর পদ্ধতির হয়'। [*আকবরনামা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩]

সিরাজীর কৃতিত্ব হলো, সন তৈরি করতে তিনি হিজরি সনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন না করেই তার উপর ভিত্তি করে নতুন সৌর সন তৈরি করেন। এতে ফারসি গুরগানি পদ্ধতি যেমন ব্যবহার করেন, তেমনি ভারতীয় শকাব্দের থেকেও দিন ও মাসের নামগুলো গ্রহণ করেন। পূর্বের ইলাহি সনে বছরের প্রথম দিনটিকে 'নওরোজ' উৎসবের দিন বলে গৃহীত হয়েছিল, এটি ছিল ফারসি বর্ষপঞ্জির প্রভাব। বাংলা সনেও এর প্রভাব চলে আসল, পয়লা বৈশাখ, নববর্ষ, উৎসবের দিন।

সিরাজী বাংলা সনের নামগুলো গ্রহণ করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় শকাব্দ থেকে। বঙ্গাব্দ ও শকাব্দের এখানেই সেতুবন্ধ। শকাব্দের বর্ষ শুরু হয় চৈত্র মাসে, বঙ্গাব্দের বর্ষ শুরু হয় বৈশাখ মাসে। তবে বর্ষ গণনার প্রথমদিকে বাংলা সন শুরু হয়েছিল অগ্রহায়ণ মাস থেকে। অগ্রহায়ণ অর্থেও রয়েছে 'বর্ষ শুরু'। বছরের 'অগ্রে' যে যায়, সে হলো অগ্রহায়ণ। [*বাংলা সনের জন্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১]। এটা ধান উৎপাদনের মাসও। সিরাজী যেহেতু ফসলি সন করেছিলেন বঙ্গাব্দকে, সেদিক থেকে তিনি ঠিকই করেছিলেন অগ্রহায়ণ দিয়ে বর্ষ শুরু করে। বর্তমানে বাংলা সনে অগ্রহায়ণ অষ্টম মাস।

বাংলা মাসের নামগুলো একটি বাদে সবগুলোই এসেছে নক্ষত্রের নাম থেকে। নিচের সারণিটি দেখা যেতে পারে:

মাসের নাম	নক্ষত্রের নাম
বৈশাখ	বিশাখা
জ্যৈষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা
আষাঢ়	আষাঢ়া
শ্রাবণ	শ্রবণা
ভাদ্র	ভাদ্রপাদ
আশ্বিন	অশ্বিনী
কার্তিক	কৃত্তিকা
অগ্রহায়ণ	(বছরের অগ্রে)
পৌষ	পুষ্য
মাঘ	মঘা
ফাল্গুন	ফল্গুনী
চৈত্র	চিত্রা

এখানে শুধু অগ্রহায়ণ মাসটি নক্ষত্রের নামে নয়। 'হায়ণ' অর্থ 'বছর' অগ্রহায়ণ মানে বছরের আগে বা বছরের শুরু। পরে ফসলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৈশাখ মাসকে প্রথম মাস করা হয়। পূর্বে বৈশাখ মাসে 'চৈতালী ফসল' তোলা হতো বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। [মুহম্মদ আবূ তালিব, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬] তবে আবহাওয়ার নানারকম বিবর্তনে ঋতুবৈচিত্র্যেও পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক কিছুতেই বিষয়

বাংলা পঞ্জিকায় ১৪২৪-এর বৈশাখ মাস

ও ফলাফলের মিল পাওয়া যাবে না। যেমন, আমাদের অভিধানে 'মধুমাস' নামে একটি শব্দ আছে, কিন্তু এর অর্থ দেওয়া আছে ' চৈত্র' মাস। [*বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, সম্পাদক আহমদ শরীফ, ঢাকা ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৪৪৬-৪৪৭]। হয়ত এক সময়ে চৈত্র মাসেই রসালো ফলগুলো প্রকাশিত হতো, তাই চৈত্র মাসকে মধুমাস বলা হতো, কিন্তু এখন রসালো ফল বাজারে আসে প্রধানভাবে জ্যৈষ্ঠ মাসে। ফসলি সনের হিসাবটাতে এমনি ঘটনা থাকতে পারে। অগ্রহায়ণ মাস প্রথম স্থান থেকে অষ্টম স্থানে চলে যায়, সে স্থান দখল করে নেয় বৈশাখ মাস। বাংলা সনের প্রাথমিক যুগে এমন কিছু ভাঙা-গড়া হয়েছে। দুনিয়ার বিভিন্ন সনের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা আছে। খ্রিষ্টীয় সন আগে শুরু হতো মার্চ মাস দিয়ে, পরে জানুয়ারি প্রথম মাস হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

বাংলা সন প্রথম থেকেই রাশি ও তিথি মেনে চলে। বারোটি রাশি: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। বাংলা সন তিথিও মেনে চলে। এগুলোর মধ্যে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা গুরুত্বপূর্ণ। ২৪ ঘণ্টায় একদিন এবং সাতদিনে (সপ্ত অহের সমাহারে) সপ্তাহ নির্ধারিত রয়েছে এ সনে। তবে ৪ সপ্তাহে একমাস কখনো বলা হয় না, বলা হয়, ৩০ দিনে একমাস। ১২ মাসে এক বছর। এখানে বৈচিত্র্য হলো, মাস গণনা হয় চান্দ্র পদ্ধতিতে, কিন্তু সন সৌর। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং নৃগোষ্ঠীর ধর্মাবলম্বীরা ধর্মীয় ও বিয়ে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে এভাবেই হিসেব করে চলে। বাংলা সন তাই অনেকটা মিশ্ররীতির সনও।

আমির ফতেহ্ উল্লাহ সিরাজী ছিলেন এই বাংলা সনের জনক। তাঁর সৃজনশীল চিন্তা ও মননশীলতায় দুনিয়ার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, যা আজও টিকে আছে। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে একদল পণ্ডিত সিরাজীর সনের সামান্য সংশোধন করেন। এতে অধিবর্ষ (লিপইয়ার) পদ্ধতি যুক্ত হয়ে বাংলা সন অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞানভিত্তিক রূপ লাভ করেছে।

এখন বঙ্গাব্দের ১৪২৩ বিদায়ের পর ১৪২৪-এর যাত্রা। বছরের প্রথম দিনটিতে উৎসবে মেতে উঠবে সমগ্র জাতি। কিন্তু একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, বাংলা সনটি হজরত মোহাম্মদ সা.-এর স্মৃতিবিজড়িত একটি ঘটনার সঙ্গে জড়িত। হিজরি সনের মতোই বাংলা সনটিকে তাই পবিত্র মনে করতে হবে। প্রতিবছরই নববর্ষ পালনের নামে আমরা যেসব উৎসব করি, তাতে নতুন নতুন নানারকম আপত্তিকর বিষয় যুক্ত হচ্ছে, পূর্বে এরকমটা ছিল না। এসব বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। আমাদের ঠান্ডা মাথায় বিষয়টা ভেবে দেখা দরকার।

লেখক : লেখক ও গবেষক, drhannapp@yahoo.com

নিবন্ধ

মুজিবনগর কেন অনিবার্য ছিল

রফিকুর রশীদ

১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ যেমন হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়, তেমনি ১৯৭১ সালের এই দিনে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জনপদ মেহেরপুরের অখ্যাত-অজ্ঞাত গ্রাম বৈদ্যনাথতলার বিস্তৃত আমবাগানে যা ঘটে যায়, সেটিও মোটেই অপরিকল্পিত বা আকস্মিক কোনো ঘটনা ছিল না। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের নেপথ্যে যেমন রয়েছে বহু বর্ণিল উত্থান-পতনময় ভিত্তিভূমি, ঠিক তেমনি মুজিবনগর দিবসের প্রেক্ষাপট রচনার নেপথ্যেও রয়েছে কতিপয় দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সুগভীর দূরদৃষ্টি, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞাপ্রসূত সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্তের প্রতিফলন। বাঙালির সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক জীবনের সংগ্রামমুখর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ এবং অবিস্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে বাংলাদেশের গণমানুষের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ এবং সেই মহান যুদ্ধে বিজয় অর্জন তথা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ নামের নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। ৯ মাসব্যাপী সমগ্র যুদ্ধ পরিচালনা,

মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন আনসার সদস্যরা, ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায় এবং বিজয় অর্জনের নেপথ্যের মহামূল্যবান চাবিকাঠিটি নির্মাণ করে ১৭ই এপ্রিলের মুজিবনগর। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন ও কৌতূহলী বাঙালি মাত্রেরই তাই মুজিবনগর দিবসের ঐতিহাসিক এবং অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যিক।

পাকিস্তানের পশ্চিমা শাসকদের দীর্ঘ তেইশ বছরের শাসন-শোষণ-অত্যাচার-নির্যাতন বাঙালিকে বাধ্য করেছিল এক রাষ্ট্রের শেকল ভেঙে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এবং কৃত্রিম জাতি পরিচয়ের ঠুনকো বাঁধন ছিঁড়ে সত্যিকারের জাতি-পরিচয়ের অন্বেষণে ব্রতী হতে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির প্রাণের স্পন্দন ও প্রত্যাশা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই গোটা জাতিকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ ধরেই স্বাধীনতার স্বপ্নে উচ্চকিত ও ঐক্যবদ্ধ করে এগিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বাঙালির দাবি আদায়ের সব পথ রুদ্ধ করে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকাসহ দেশের প্রায় সব প্রধান শহরে নিরস্ত্র-নিরীহ বেসামরিক জনগণকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যাযজ্ঞ চালালে সামরিক দিক থেকে অপ্রস্তুত অবস্থাতেও বাঙালিকে রুখে দাঁড়াতে হয়। এদিকে বঙ্গবন্ধু ঐ রাতেই, ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়ে যান। এমনকি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের অন্যান্য নেতৃবৃন্দও পূর্বেই আত্মগোপন করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে ২৫ শে মার্চের পর থেকে মুক্তিকামী বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী 'যার যা আছে তাই নিয়ে' দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করে এবং কোথাও কোথাও তাদের বিপর্যস্ত করে ফেলে। পঁচিশের কাল রাতেই যশোর সেনানিবাস থেকে বেলুচ রেজিমেন্টের ১৪৭ জন সৈন্য এসে কুষ্টিয়া দখল করে নিলে চুয়াডাঙ্গাস্থ ইপিআর-এর উইং কমান্ডার মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর নেতৃত্বে দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন খোলা হয় এবং মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা-কুষ্টিয়ার হাজার হাজার ছাত্র-জনতা ৩০ ও ৩১শে মার্চ দুদিনব্যাপী যুদ্ধ করে কুষ্টিয়া শত্রুমুক্ত করে। এই যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ ভরাডুবি ঘটে; একমাত্র জীবিত সৈনিক লে. আতাউল্লাহ শাহ ছাড়া আর সবাই নিহত হয় বেসামরিক বাঙালি জনতার হাতে। শুধু কুষ্টিয়া-যুদ্ধ বলে তো কথা নয়, সারা দেশেই দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ-সংগ্রাম গড়ে তোলার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু সত্যিকারের কথায় তা ছিল পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমন্বয়বিহীন এবং একক কমান্ডের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এ সময়ে রণকৌশলে পরিবর্তন আনা অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠে। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মনোবল ফিরিয়ে একক কমান্ডের অধীনে তাদের সবাইকে মুক্তিযোদ্ধায় রূপান্তর করা এবং সেই মহান যুদ্ধ পরিচালনার মতো জরুরি এবং জটিল কাজটির দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ তাজউদ্দীন আহমদ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ এবং কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই দুই নেতা বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হয়ে যাবার পর ২৬ মার্চ ঢাকা থেকে বেরিয়ে বহু জনপদ ঘুরে ৩০ শে মার্চ (কুষ্টিয়ায় ততক্ষণে প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে) ঝিনাইদহে পৌঁছলে এসডিপিও মাহবুবউদ্দিন তাঁদের সতর্কতার সঙ্গে চুয়াডাঙ্গায় নিয়ে আসেন। তাঁদের পরিকল্পনা–চুয়াডাঙ্গা কিংবা মেহেরপুর সীমান্ত দিয়ে তাঁরা ভারতে গিয়ে বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য ভারতীয় সাহায্য-সহযোগিতার ব্যবস্থা করবেন। এই একই লক্ষ্যে মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী ইতোমধ্যেই ভারতের নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. মুখার্জী এবং ৭৬-বিএসএফ-এর অধিনায়ক লে. কর্নেল চক্রবর্তীর সঙ্গে কয়েক দফা যোগাযোগ করেছেন, ভারতীয় জনগণের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে লেখা তাঁর চিঠি *অমৃতবাজার* এবং *যুগান্তর* পত্রিকায় ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০শে মার্চ ১৯৭১ সংখ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে

ছাপা হয়েছে এবং ভারতের বেতাই সীমান্তে বিএসএফ কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর ২৯শে মার্চের বৈঠকের শর্ত অনুযায়ী তিনি ৩০শে মার্চ সন্ধ্যায় জীবননগরের অদূরে চেংখালি চেকপোস্টে ভারতীয় অস্ত্র আনতে যান।

এসব খবর জানার পর মাহবুবউদ্দিন বিশিষ্ট দুই অতিথিকে নিয়ে তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরীর সঙ্গে ৩০ মার্চ রাতে ভারতীয় সীমান্ত চেংখালিতে পৌঁছেন। অতঃপর নেতৃবৃন্দ কলকাতা হয়ে দিল্লি গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী একজন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ দেওয়ার কথা নয়। তবে ভারতীয় পার্লামেন্ট ৩১শে মার্চ একটি প্রস্তাব পাস করে যে, বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে জানতে পারলে পূর্ববাংলার জনগণকে সাহায্য করার কথা বিবেচনা করা হবে। বিচক্ষণ রাজনীতিক তাজউদ্দীন ৩রা এপ্রিল তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিমত্তায় এই অস্ত্রটি যথাযথভাবে কাজে লাগালেন। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ বঙ্গবন্ধু ও দুই সহসভাপতি– সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও খোন্দকার মোশতাক এবং দুই সাধারণ সম্পাদক–কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের এএইচএম কামারুজ্জামান ও প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের তাজউদ্দীন আহমদ– এই পাঁচজনকে নিয়ে আওয়ামী লীগ হাই কমান্ড গঠিত হয়েছিল। দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে এই হাই কমান্ড সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রাখে। অত্যন্ত জরুরি এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তাজউদ্দীন আহমদ এই বিশেষ অধিকার প্রয়োগে এগিয়ে এলেন দৃঢ়তার সাথে। ৩রা এপ্রিল তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানালেন যে, ২৫/২৬ মার্চেই শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপ্রধান করে একটি সরকার গঠিত হয়েছে, তিনি নিজে এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ হাই কমান্ডের সবাই এই মন্ত্রিসভায় আছেন। তাজউদ্দীন আহমদের এই উপস্থিত ও বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অসাধারণ ভূমিকা রাখে। কারণ ভারতীয় পার্লামেন্টে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এরপর থেকে বাংলাদেশ সরকারকে সব রকম সহায়তা প্রদান করে ভারত সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ও বিচ্ছিন্নভাবে শুরু হয়ে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধে নিয়ন্ত্রণ আনা এবং নেতৃত্ব প্রদান সম্ভব হয়।

স্ব-উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা দিয়ে তাজউদ্দীন আহমদ নিজেই সমালোচিত হন নিজের দলের লোকজনের কাছে। মুক্তিযুদ্ধে আশু করণীয় এবং কর্মসূচি তৈরি করে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শিলিগুঁড়ি অস্থায়ী বেতার থেকে ভাষণদানের প্রস্তুতি নেন। তাজউদ্দীন অনুভব করেন, বাংলার প্রতিটি প্রান্তরে দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে পৈশাচিক হত্যালীলা চালাচ্ছে, তার মোকাবিলার জন্য দেশত্যাগী ছাত্র-যুবকদের সংগঠিত করে ট্রেনিং দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে পাঠানো দরকার। লক্ষ লক্ষ ভিটেমাটি ছাড়া অসহায় শরণার্থীর আহার ও আশ্রয় দরকার। ভারতসহ বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশে পাকিস্তানিদের চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় ও একতরফা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারণা দরকার। আর এ সবকিছুর জন্য সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

তাজউদ্দীন আহমদ মালদহ, বালুরঘাট, শিলিগুঁড়ি, রূপসা, শিলচর হয়ে আগরতলা পর্যন্ত পথে পথে ঘুরে ঘুরে খুঁজে বের করেন ক্যাপটেন মনসুর আলী, আব্দুল মান্নান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মোশতাক ও কর্নেল ওসমানীকে। তারপর ১০ই এপ্রিল আগরতলাতেই আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় বাংলাদেশ সরকার এবং ১১ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ দাবি করেন– বাংলাদেশকে দখলদারমুক্ত করার জন্য সারা দেশে যে যুদ্ধ তৎপরতা চলছে তা এই সরকারের নিয়ন্ত্রণেই।

মুজিবনগর কমপ্লেক্সে মহান মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য, মেহেরপুর

সত্যিকারের কথায় বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও সুস্পষ্ট নির্দেশনাবিহীন সেই দুঃসময়ে জাতীয় জীবনের চরম ক্রান্তিকালে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন এতটাই অনিবার্য হয়ে উঠেছিল যে, সেসময় সরকার গঠিত না হলে আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ প্রক্রিয়াকে পাকিস্তান সরকার সারা দুনিয়ার কাছে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা বলে অপপ্রচার চালাতে পারত। দূরদর্শী রাজনীতিবিদ তাজউদ্দীন আহমদ সেদিন বঙ্গবন্ধুকে প্রধান করে সরকার গঠনের মধ্যদিয়ে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন মুক্তিকামী বাঙালি জাতি তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সরকারের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাণ বাজি রেখে লড়াই করছে এবং মুক্তির এ লড়াইয়ে তারা বিজয়ী হবেই। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তিনি মুক্তিকামী বাঙালির পাশে দাঁড়াবার জন্য বিশ্ববিবেকের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানান।

সরকার গঠন নিয়ে তাজউদ্দীন আহমদ নিজ ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাগুণে প্রতিকূলতা যেমন কাটিয়ে ওঠেন, তেমনি অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বাংলার মুক্ত মাটিতেই এই সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ এবং সুনির্দিষ্ট ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিশ্ববিবেকের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণার আনুষ্ঠানিকতা প্রদর্শনের আয়োজনেরও পরিকল্পনা করেন। কিন্তু কোথায় অনুষ্ঠিত হবে সেই আনুষ্ঠানিকতা? আনুষ্ঠানিকতাই তো! বাঙালি জাতির মুক্তির প্রশ্নে প্রয়োজন ছিল সরকার গঠনের, সেটা হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন সেই সরকারের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ এবং শপথ গ্রহণ, প্রয়োজন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠের মধ্যদিয়ে নতুন সার্বভৌম দেশ পরিচালনাসহ দেশকে দখলদারমুক্ত করার জন্য একক কমান্ডের অধীনে যুদ্ধ পরিচালনা। সর্বোপরি গোটা জাতিকে স্বাধীনতার সিংহদুয়ারে পৌঁছে দেওয়া। ভারতের মাটিতে বসে সরকারের রূপরেখা প্রণীত হলেও সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবার আনুষ্ঠানিকতার সবটুকুই করতে চাইলেন বাংলাদেশের কোনো এক মুক্তাঞ্চলে। তখনো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু মুক্তভূমি রয়েছে, যেখানে আগ্রাসী পাকিস্তানি সৈন্যের বুটের ছাপ পড়েনি। কিন্তু এই বিশাল আয়োজনের জন্যে সব জায়গা সমান যোগ্য নয়। সার্বিক নিরাপত্তার দিকটা তো আগে দেখতে হবে। প্রবাসী নেতার মনে পড়ে যায়–ভারতে প্রবেশের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের সুদৃঢ় অবস্থান এবং মেহেরপুরের এসডিও তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরীর অসাধারণ কর্মনৈপুণ্য ও সাহসিকতার কথা, মনে পড়ে কুষ্টিয়া-যুদ্ধে অপূর্ব সাফল্যের কথা এবং চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর সীমান্ত এলাকার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা। ফলে সিদ্ধান্ত নেন

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার মুক্ত ভূমিতেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সেই অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গাতে প্রস্তুতি চলতে থাকে। কিন্তু আকাশবাণীর খবরে এ প্রস্তুতির কথা প্রচারিত হয়ে গেলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যশোর সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, বিষয়খালি প্রভৃতি স্থানে প্রতিরক্ষা অবস্থান ভেঙে ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকে। এমনকি দু'এক দিনের মধ্যেই চুয়াডাঙ্গায় পাকিস্তান বিমানবাহিনী বোমা হামলা চালায়। যার প্রেক্ষিতে দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের সদর দপ্তরই এক সময় চুয়াডাঙ্গা থেকে সরিয়ে মেহেরপুরে আনতে হয়।

এই সংকটময় মুহূর্তে বাংলাদেশ সরকার ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর সঙ্গে আলোচনাক্রমে মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী গ্রাম বৈদ্যনাথতলার বিশাল আমবাগানের ছায়াঢাকা পাখি ডাকা মনোরম চত্বরকেই মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণের জন্য এবং অস্থায়ী রাজধানী (প্রতীকী অর্থে) স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান বলে নির্বাচন করে। চুয়াডাঙ্গা এবং মেহেরপুর থেকে এ স্থানের দূরত্ব, সড়কপথে এ দুর্গম এলাকার সঙ্গে যোগাযোগের অসুবিধা এবং মাত্র ১০০ গজের মধ্যে ভারতীয় সীমান্ত হৃদয়পুর থেকে সড়কপথে কলকাতার যোগাযোগের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই মানচিত্রে সীমান্ত সংলগ্ন আরো অনেক জায়গা মুক্তাঞ্চলের মধ্যে থাকলেও শেষ পর্যন্ত বৈদ্যনাতথলাকেই বেছে নেওয়া হয়। এছাড়াও বৈদ্যনাথতলার ভৌগোলিক অবস্থানটি এমনই কৌশলগত সুবিধাজনক স্থানে যে, পাকিস্তানি বাহিনী যদি আকাশপথে এসে বিমান হামলা করতে চায়, তাহলেও তাদের ভারতীয় আকাশসীমায় প্রবেশ করতে হবে। তারা নিশ্চয় সেই ঝুঁকি কিছুতেই নেবে না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের চরম সংকটময় সময়ে সেদিনের বাস্তবতার নানান প্রেক্ষিত বিবেচনা করে সীমান্ত সংলগ্ন মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় বাংলাদেশ সরকারের যে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, সময়ের প্রয়োজনে তা ছিল একেবারেই অনিবার্য ঘটনা।

১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক পর্যায়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বলেছেন, 'সকাল ন'টার দিকে জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম অন্যদের সাথে নিয়ে যেখানে পৌঁছুলেন। আমি তাদের নিয়ে এলাম বৈদ্যনাথতলার মঞ্চে। ওখানে আশপাশের গ্রাম থেকে কিছু চেয়ার সংগ্রহ করে আনা হলো। সংগৃহীত চেয়ারের মধ্যে সবগুলো পূর্ণাঙ্গ নয়। কোনোটায় একটা হাতল নেই, কোনোটার একটা পায়া খোয়া গেছে। মঞ্চ প্রহরায় নিয়োজিত আনসারদের জন্য কিছু রান্না হয়েছিল। বেলা প্রায় এগারোটা নাগাদ বহু প্রতীক্ষিত অনুষ্ঠান শুরু হলো। আমি জিপে করে জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জেনারেল এমএজি ওসমানী ও অন্য কয়েকজনকে মঞ্চের ৫০ গজের মধ্যে তোরণের কাছে নিয়ে এলাম।'

এরপর শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা। সামরিক কায়দায় জাতীয় নেতৃবৃন্দকে অভিবাদন জানান ক্যাপটেন মাহবুব উদ্দিন স্থানীয় কয়েকজন আনসার সদস্যকে নিয়ে। জাতীয় সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে মঞ্চে উঠে এসে আসন গ্রহণ করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামান, খোন্দকার মোশতাক আহমেদ এবং কর্নেল এমএজি ওসমানী। স্বেচ্ছাসেবকেরা তাঁদের হাতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করলে উপস্থিত জনতা বিপুল করতালিতে অভিনন্দিত করে। পবিত্র কোরান-বেদ-বাইবেল পাঠের পর আওয়ামী লীগের চিপ হুইপ অধ্যাপক মো. ইউসুফ আলী বাংলার মুক্ত মাটিতে স্বাধীনতাকামী কয়েক হাজার জনতা এবং শতাধিক দেশি-বিদেশি সাংবাদিকের সামনে দাঁড়িয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। ঐতিহাসিক সেই ঘোষণাপত্রে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক ইউসুফ আলী শপথবাক্য পাঠ করান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রপ্রধান এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এরপর তাঁর সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদের নাম ঘোষণা করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে মন্ত্রিপরিষদের অন্য সদস্যদের নাম ঘোষণা করে উপস্থিত সুধী, দেশি-বিদেশি সাংবাদিক এবং জনতার সামনে সবার পরিচয় করিয়ে দেন। মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে এরপর বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে কর্নেল এমএজি ওসমানী এবং সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ পদে কর্নেল আব্দুর রবের নাম ঘোষণা ও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। অত্যন্ত উৎফুল্ল ও আনন্দ উদ্দীপনাময় পরিবেশে পরিচয়পর্ব শেষ হলে শুরু হয় বক্তৃতা পর্ব। প্রথমেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ উপস্থিত গণপরিষদ সদস্য, সুধী, দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে ৩০ মিনিটব্যাপী উদ্দীপনাময় এক ভাষণ দেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ভাষণ শেষে তিনি ঘোষণা করেন– 'আজ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হবে এই বৈদ্যনাথতলা এবং এর নতুন নাম হবে মুজিবনগর'।

মুজিবনগরের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর ভাষণের শুরুতেই বলেন, 'আজ এই মুজিবনগরে একটি নতুন স্বাধীন জাতি জন্ম নিল।' এরপর তাঁর মূল্যবান ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ প্রেক্ষাপট তুলে ধরে মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা ও অনিবার্যতার প্রসংগ ব্যাখ্যা করেন এবং সবশেষে প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন–'এ যুদ্ধে আজ না জিতি কাল জিতব, কাল না জিতি পরশু জিতবই।' যথার্থই সেই মহান যুদ্ধে আমরা জিতেছি, মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে বাঙালি ছিনিয়ে এনেছে বিজয়ের সোনালি সূর্য।

একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ১৭ই এপ্রিল এক অনন্য সাধারণ ডেটলাইন, আর মুজিবনগর হচ্ছে স্বাধীনতার সিংহদুয়ার। ১৭ই এপ্রিলের পর থেকে মুজিবনগরের নামেই চলেছে বাংলাদেশের সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন, চলেছে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ, মুজিবনগরের নামেই সংগৃহীত হয়েছে আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহানুভূতি, শেষ পর্যন্ত মহান বিজয়ও অর্জিত হয়েছে, এই নামেই। সেসময়ে সারা দেশেরই অন্য নাম হয়ে যায় মুজিবনগর।

দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির প্রতিরোধ সংগ্রাম স্বতঃস্ফূর্ত হলেও তা ছিল অনেকাংশেই অসংগঠিত, পারস্পরিক সম্পর্ক ও শৃংখলাবিহীন; একক কমান্ডের নিয়ন্ত্রণহীন হওয়ার কারণে এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ প্রক্রিয়া যখন বিপর্যস্তপ্রায়, ঠিক তেমনি সময়ে মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ এবং সমগ্র মুক্তিযুদ্ধ তৎপরতাকে সেই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে সুপরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে দেশমাতাকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে ১৭ই এপ্রিলের অঙ্গীকার ঘোষণা বাঙালি জাতির জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত ও গৌরবময় ঘটনা। সেদিন মুজিবনগরে এই যুগান্তকারী ঘটনা না ঘটলে আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্নই হয়ত ভূলুণ্ঠিত হতো। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্বই দাঁড়িয়ে আছে মুজিবনগরের ভিত্তির ওপরে। এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব মানতে হলে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিলের মুজিবনগরের প্রতি দলমতনির্বিশেষে সবাইকে শ্রদ্ধাশীল হতেই হবে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মুজিবনগর অধ্যায় এতটাই অনিবার্য এবং অনতিক্রম্য।

তথ্যসূত্রঃ স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র ৯ম খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, পৃষ্ঠা-৩৬৬

লেখক : শিক্ষক ও সাহিত্যিক, মেহেরপুর

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ রূপকল্প-২০২১

শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ

সম্পাদনা বিভাগ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের পর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া ও রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার অঙ্গীকার নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়। তৃতীয় মেয়াদে ২০১৪ সালে সরকার গঠনের পর দেশের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্তি, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করে। একইসাথে জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছানো, নারী ক্ষমতায়ন বাস্তবায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোট দশটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

বিশ্বব্যাপী চরম অর্থনৈতিক মন্দা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টায় চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি সাত শতাংশের মাইলফলক স্পর্শ করেছে। মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার নেমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৪ ভাগে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন'। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র্যবিমোচনে দশটি বিশেষ উদ্যোগ হাতে নিয়েছেন। এই উদ্যোগসমূহের শতভাগ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ ও ২০৪১-এর মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সরকার।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)-তে সাফল্যের পর ২০১৬ সাল থেকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলেছে দেশ। জাতিসংঘের ভাষ্যমতে, এমডিজির লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশকে বলা হয় এমডিজির 'রোল মডেল'। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-তে সাফল্য অর্জনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশটি উদ্যোগ কার্যকরী ভূমিকা রাখবে এবং ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়তে সহায়তা করবে।

উদ্যোগ-১ : একটি বাড়ি একটি খামার ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

শেখ হাসিনার উপহার
একটি বাড়ি একটি খামার
বদলাবে দিন তোমার আমার

গ্রামের দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প আজ একটি বিপ্লবে পরিণত হয়েছে। আর এই বিপ্লবের মূল সুর–'দিন বদলের স্বপ্ন আমার, একটি বাড়ি একটি খামার'। এ প্রকল্পের ভিশন হলো নিজস্ব পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবিকায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন। 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পটি ১লা জুলাই ২০১৬ থেকে 'পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক' নামে যাত্রা শুরু করেছে। এ ব্যাংকের ৪৯% অংশের মালিক প্রকল্পের উপকারভোগীগণ।

অর্জন

- সারাদেশে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় ৪০ হাজার ৩১৬টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গড়ে উঠেছে।
- সমিতির উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ২৪ লাখ ৩৪ হাজার।
- প্রকল্পের প্রত্যক্ষ উপকারভোগী ১ কোটি ২২ লক্ষ জন।
- বছরে প্রকল্পভুক্ত পরিবারে আয় বৃদ্ধি ১০ হাজার ৯২১ টাকা।
- প্রকল্প এলাকায় নিম্ন আয়ের পরিবারের সংখ্যা ১৫% থেকে কমে ৩%-এ দাঁড়িয়েছে।
- প্রকল্প এলাকায় অধিক আয়ের পরিবারের সংখ্যা ২৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১%-এ উন্নীত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- দারিদ্র্যের হার ২৪.৮ শতাংশ থেকে ১৮.৬ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং ২০২০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের হার ৮ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে এ প্রকল্প কাজ করছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে জুন ২০১৬ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ১০০ শাখার উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি

উদ্যোগ-২ : আশ্রয়ণ প্রকল্প

আশ্রয়ণের অধিকার
শেখ হাসিনার উপহার

কর্মমুখর একটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার

ঘূর্ণিঝড় ও নদী ভাঙনে ছিন্নমূল অসহায় পরিবারের পুনর্বাসন এ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘূর্ণি-দুর্গত মানুষের জন্য নোয়াখালীর রামগতিতে 'গুচ্ছগ্রাম' গড়েছিলেন। একই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭-এর ঘূর্ণিঝড়ে গৃহহীন মানুষের জন্য আশ্রয়ণ গড়ে তোলেন। স্থানীয় প্রশাসন এবং সশস্ত্রবাহিনীর যৌথ সহায়তায় গড়ে উঠেছে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ ও প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলাও আশ্রয়ণ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। আশ্রয়ণ কোনো সাহায্য প্রকল্প নয়, হতদরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকার ন্যায্য অধিকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জনবান্ধব সরকার ছিন্নমূল মানুষের সেই অধিকার নিশ্চিত করছে।

অর্জন

- সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের ৩টি পর্যায়ে ১৯৯৭ থেকে জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত ১ লাখ ৩৯ হাজারের বেশি পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে।
- ৫০ হাজার পরিবারের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ২০০২ সালে শুরু হয়েছে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, যার মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩৪,২১৫টি পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে।
- ইতোমধ্যে ৬৩০টি প্রকল্প গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে এবং প্রায় ৩ লাখ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।
- ২২৭টি প্রকল্প গ্রামে জমি আছে ঘর নাই–এ রকম প্রায় সাড়ে ৩ হাজার পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় ২০১৭ সালের মধ্যে ৫০ হাজার গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসন করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

একটি আশ্রয়ণ প্রকল্পে কর্মমুখর পরিবার

উদ্যোগ-৩ : ডিজিটাল বাংলাদেশ

শেখ হাসিনার উপহার
ডিজিটাল সরকার

বঙ্গবন্ধু সুখী-স্বনির্ভর 'সোনার বাংলা' গড়তে চেয়েছিলেন। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই সময়োপযোগী 'ডিজিটাল' কর্মসূচি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশ। 'রূপকল্প–২০২১' বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর মধ্যম আয়ের দেশ। সেই লক্ষ্য পূরণে জাতি অঙ্গীকারবদ্ধ। জনগণের দোরগোড়ায় অনলাইন রাষ্ট্রীয় সেবা পৌঁছানো এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য–যাতে ভোগান্তিবিহীন, দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছতার সাথে স্বল্পতম সময়ে জনগণের কাছে সেবা পৌঁছানো যায়। মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে পৌঁছানো এবং সরকারি যাবতীয় তথ্য ও সেবাকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরা এ উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

অর্জন

- ৫,২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার (তথ্য সেবাকেন্দ্র) স্থাপন করা হয়েছে।
- এ সকল তথ্য সেবাকেন্দ্র থেকে অনলাইনে ২০০ ধরনের সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বর্তমানে দেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ১৩.১৪ কোটি এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৬.৬৮ কোটি।
- ই-পেমেন্ট ও অনলাইন ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে ।
- ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েব পোর্টাল 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন' চালু করেছে সরকার।
- আইটি সেক্টরে ৭০০ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে।
- প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে গেছে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার সুযোগ।
- তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্জন করেছেন আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- আইসিটি খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে ব্যয় জিডিপির ০.৬ শতাংশ থেকে ১ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরো কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।
- ব্রডব্যান্ড কভারেজ ৩০ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- আইসিটি ও পর্যটন খাত থেকে বৈদেশিক আয় ১.৫ বিলিয়ন ডলার থেকে ২.৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ।

উদ্যোগ-৪ : শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

শিক্ষিত জাতি সমৃদ্ধ দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্যোগে যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশে ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক

বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। সে সময় সরকারি শিক্ষকের পদমর্যাদা লাভ করেন দেশের ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন শিক্ষক। এই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যার সুফল লাভ করছে শিক্ষার্থীরা।

এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে স্কুলগামী শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে আনয়ন, মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ, মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান, মেয়েদের শিক্ষা সহায়তা উপবৃত্তি প্রদান, সকল শ্রেণির মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা বৃত্তি প্রদান, পর্যায়ক্রমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণ করা এবং আইটি নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনসহ শ্রেণিকক্ষসমূহে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিতকরণ।

অর্জন

- দেশে শিক্ষার হার গত ৮ বছরে ৪৪ শতাংশ থেকে ৭১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- এ পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে ১৮৯ কোটি ২৯ লক্ষ বই বিতরণ করা হয়েছে।
- এ বছর ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে ৩৬ কোটি ২১ লক্ষ বই বিতরণ করা হয়েছে।
- প্রথম শ্রেণি থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ১ কোটি ৭৩ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৫ সাল থেকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্রেইল পদ্ধতির বই বিতরণ করা হচ্ছে।
- বর্তমান সরকারের সময়ে ২৬, ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে।
- এ পর্যন্ত ১ লাখ ৪৪ হাজার ৮৭৬ জন শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করা হয়েছে।
- সারাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩ হাজার ১৭২টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- ৩১ হাজার ১৩১টি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।
- পাঠ্যপুস্তকের অনলাইন ভার্সন অর্থাৎ ই-কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার হার শতভাগে উন্নীতকরণ। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

উদ্যোগ-৫ : নারীর ক্ষমতায়ন

শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি
নারী জাগরণে অগ্রগতি

সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য নারী ক্ষমতায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রণয়ন করা হয়েছে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১'। কৃষিকাজ থেকে শুরু করে এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গে নারীরা উড়িয়েছে বাংলাদেশের বিজয় পতাকা। নারী জনশক্তি-নির্ভর তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ।

অর্জন

- নারী ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত কর্মসূচি দেশে নারীদের সামাজিক অবস্থানকে দৃঢ় অবস্থানে নিয়ে গেছে।
- দেশব্যাপী ১২ হাজার ৯৫৬টি পল্লি মাতৃ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মা ও শিশুর যত্নসহ যাবতীয় বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে।
- নারী ক্ষমতায়ন ও নারী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে নারী পুনর্বাসন বোর্ড, জাতীয় মহিলা সংস্থা, মহিলা অধিদপ্তর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- মহিলা হোস্টেল নির্মাণ, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণসহ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে।
- সরকারি কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ৪০টি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার সেনসিটিভ বাজেট তৈরি হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ২০ থেকে ২৪ বছরের নারীদের স্বাক্ষরতার হার শতভাগে উন্নীতকরণ।
- সরকারি চাকরিতে নারী কর্মকর্তার হার ২০২০ সাল নাগাদ ২৫ শতাংশে উন্নীতকরণ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই জানুয়ারি ২০১৭ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণভবন থেকে তিন দিনব্যাপী দেশজুড়ে উন্নয়ন মেলা ২০১৭– এর উদ্‌বোধন করেন

উদ্যোগ-৬ : ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্যবিমোচন এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি বিদ্যুৎ। আর্থসামাজিক ও মানব উন্নয়নে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো এ কর্মসূচির লক্ষ্য। ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেই শেখ হাসিনা দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধন করেন। তার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলে দেশের সর্বত্রই এখন বিদ্যুতের আলো পৌঁছে গেছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সৌরবিদ্যুৎ, উইন্ডমিল ও বায়োগ্যাস থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়াও দেশে প্রথমবারের মতো শুরু হতে যাচ্ছে পরমাণু বিদ্যুতের উৎপাদন।

অর্জন

- ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্ব গ্রহণকালে বিদ্যুতের উৎপাদন ছিল ৪৯৪২ মেগাওয়াট। বর্তমানে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা মার্চ ২০১৭ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নির্মাণ সমাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও শতভাগ বিদ্যুতায়নের উদ্‌বোধন করেন

উৎপাদন ক্ষমতা ১৫,৩৫১ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।

- স্থাপিত হয়েছে ৮১টি নতুন প্লান্ট। নির্মাণাধীন রয়েছে ১৫টি এবং আরো ৪১টি প্লান্ট নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
- বর্তমানে ২ কোটি ৩৬ লক্ষেরও বেশি গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।
- সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে দুর্গম চর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে।
- দেশের বিদ্যুৎ খাতের অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে অবকাঠামো, কৃষি ও শিল্প খাতে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ৭ম পঞ্চবার্ষিকী (২০১৬-২০২০) পরিকল্পনায় ২০২০ সাল নাগাদ ২৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং দেশের ৯৬ শতাংশ এলাকাকে বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে এবং ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ চলছে।
- রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্যোগ-৭ : কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

শেখ হাসিনার অবদান
কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাই এ কর্মসূচির ভিশন। সকল জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাই এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এর আওতায় সন্তানসম্ভবা মায়েদের মাতৃত্বকালীন যাবতীয় সেবা নিশ্চিত করা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার সকল ধরনের সেবা প্রদান করা, জন্ম, মৃত্যু নিবন্ধন এবং নতুন বিবাহিত দম্পতি ও সন্তানসম্ভবা মায়েদের নিবন্ধিত করা, মা ও শিশুর খাদ্য ও পুষ্টির বিষয়ে সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং জটিল স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রে উন্নততর চিকিৎসার জন্য উপজেলা ও জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্জন

- গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছাতে প্রতি ৬০০০ মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তোলা হয়েছে।
- সারাদেশে ১৩,১৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে বিনামূল্যে ৩০ প্রকার ওষুধ সরবরাহের মাধ্যমে সাধারণ রোগের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- প্রতি হাজারে শিশুমৃত্যুর হার ৪১ থেকে ৩৭-এ নামিয়ে আনা এবং প্রতি লাখে মাতৃমৃত্যু হার ১৯৪ থেকে ১০৫-তে নামিয়ে আনা।
- ১২ মাসের নিচের শিশুদের শতভাগ টিকাদান কর্মসূচির আওতায় আনা।
- দম্পতিদের জন্মনিয়ন্ত্রণ সুবিধার আওতায় আনার হার ৭৫ শতাংশে উন্নীতকরণ।

উদ্যোগ-৮ : সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

শেখ হাসিনার বারতা
গড়ো সামাজিক নিরাপত্তা

বয়স্ক ও অক্ষম জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির লক্ষ্য। অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য মাসিক ভাতার আওতায় আনা হয়েছে। ভূমিহীন, ছিন্নমূল পরিবারের জন্য সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অর্জন

- সমাজের অবহেলিত, অক্ষম, নিঃস্ব জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার ২৮টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১৪২টি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রায় ৩৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
- প্রায় ২৫ লক্ষ অসহায় বয়স্ক মানুষকে মাসে ৪০০ টাকা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৬ কুড়িগ্রামে ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি

হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

- ৯ লাখের অধিক বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত নারীকে প্রতি মাসে ৪০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
- এক লক্ষ ২০ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫৫ হাজার একর কৃষিজমি বিতরণ করা হয়েছে।
- কর্মহীন মৌসুমে খেটে খাওয়া মানুষের আয় বৃদ্ধির জন্য চালু করা হয়েছে ৪০ দিনের কর্মসূচি।
- সমাজের এতিম, প্রতিবন্ধী, হিজড়া জনগোষ্ঠী, দলিত ও বেদেদের জীবনমান উন্নয়নে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ২০২০ সাল নাগাদ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি খাতে ব্যয় জিডিপির ২.৩ শতাংশে উন্নীতকরণ।

উদ্যোগ-৯ : বিনিয়োগ বিকাশ

শেখ হাসিনার নির্দেশ
বিনিয়োগবান্ধব বাংলাদেশ

বাংলাদেশ এক বিপুল সম্ভাবনার দেশ। অতীতে এ দেশের সৌন্দর্য এবং সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আরব ও ইউরোপ থেকে বণিকেরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এ দেশে আসত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্ব নিয়েই দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বেশকিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বিনিয়োগের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো বিদ্যুৎ। বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ ঘাটতি দূর করে উৎপাদন ক্ষমতা ১৫,৩৫১ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছে। যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন বিনিয়োগের নতুন দ্বার উন্মোচিত করেছে। নির্মাণাধীন পদ্মা সেতুর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। মহাসড়কসমূহ চার লেনে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে দেশের অভ্যন্তরে এবং আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্য পরিবহণের ব্যবস্থা সহজ হয়েছে। চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর অত্যাধুনিক সমুদ্রবন্দর হিসেবে গড়ে উঠেছে।

অর্জন

- দেশের ৮টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ইপিজেড-এ ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ, তিন মাসে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৩,৮৮৮.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিনিয়োগ খাতে প্রবৃদ্ধি ১৪০.৫৮ মিলিয়ন ডলার। ২০১১ সালে প্রথমবারের মতো বিদেশি বিনিয়োগ ১০০ কোটি মার্কিন ডলার অতিক্রম করে। ২০১৫ সালে তা ২০০ কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়।
- বিনিয়োগকারীদের জন্য সরকার কর অবকাশসহ বিভিন্ন প্রণোদনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ইতোমধ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার কাজ এগিয়ে চলেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- অধিকতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে 'রূপকল্প-২০২১'-এর আওতায় বৈদেশিক বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ৫.৪ বিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।

উদ্যোগ-১০ : পরিবেশ সুরক্ষা

শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ

প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা, গবেষণা, উদ্ভিজ্জ জরিপ এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ ও বন নিশ্চিতকরণ এ উদ্যোগের লক্ষ্য। বিজ্ঞানভিত্তিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বসবাস উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে মোট বনভূমির পরিমাণ সম্প্রসারণ, বন ও বনজ সম্পদের উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও শনাক্তকরণ, দারিদ্র্যবিমোচন, পরিবেশ দূষণরোধ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং টেকসই পরিবেশ উন্নয়নই এ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

অর্জন

- ২০০৫-০৬ সালের শতকরা ৭.৮ ভাগ থেকে বনভূমির বিস্তার ২০১৫-১৬ সালে প্রায় শতকরা ১৭.৬২ ভাগে উন্নীত হয়।
- ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩, ১ জুলাই ২০১৪ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। এ আইনে বর্তমানে সনাতন প্রযুক্তির ১২০ ফুট চিমনি বিশিষ্ট ইটভাটায় ইট উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ যাবৎ শতকরা ৪৯.৮৪ ভাগ ইটভাটা পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে রূপান্তর করা হয়েছে।
- বায়ু দূষণ রোধের জন্য বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই জুন ২০১৬ গণভবনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপণে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদান করেন –পিআইডি

৪৮৬.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (Clean Air & Sustainable Environment-CASE) প্রকল্পটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে।

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ১৮২টি শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার প্লান্ট (Effluent Treatment Plant ETP) স্থাপিত হয়েছে। চামড়া শিল্প থেকে ঢাকা শহর ও বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনপূর্বক হাজারীবাগে ট্যানারিগুলো সাভারের হরিণধরা এলাকায় স্থানান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- পরিবেশ সংরক্ষণে গৃহীত অন্যান্য আইনগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন ২০১০, পরিবেশ আদালত আইন ২০১০, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন ২০১০, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১২।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষেত্রে তাঁর সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের জন্য জাতিসংঘের পলিসি লিডারশিপ শ্রেণিতে 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ ২০১৫' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ২০২০ সাল নাগাদ বনভূমির হার ২০ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে বায়ুর গুণগত মান বাড়ানো এবং বায়ু দূষণ কমিয়ে আনা।
- শিল্প কারখানায় বর্জ্য নির্গমন শূন্যতে নামিয়ে আনা।
- ১৫ শতাংশ জলাশয় শুষ্ক মৌসুমে অভয়ারণ্য হিসেবে গড়ে তোলা।

সূত্র : শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ পুস্তিকা, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রবন্ধ

বাংলাদেশের বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় পাখি

শরীফ খান

১৯৭১ সালে যাদের বয়স ছিল ১০ থেকে ১৫ বছর– বাংলাদেশের সেই সব মানুষের স্মৃতিতে মোরগশকুন বা রাজশকুনের কথা গেঁথে আছে। বাংলাদেশের এমন কোনো অঞ্চল ছিল না– যেখানে রাজশকুনের দেখা মিলত না, বিশেষ করে গরু-মোষের মরদেহের কাছে। গরু-মোষ মরলে তখন মৃতদেহ বা 'মড়ি' ফেলে দেওয়া হতো খোলা মাঠ-প্রান্তর, চর, নদীতীর ইত্যাদি স্থানে। ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন আসত– অবশ্যই আসত একটা রাজশকুন (Red-headed vulture)। সুদর্শন শকুনটিকে সাধারণ শকুনেরা সমীহ করত। সাধারণ মানুষের ধারণা এরকম ছিল যে, রাজা মড়ি স্পর্শ না করা পর্যন্ত অন্য শকুনেরা মড়ির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে না– 'রাজ সম্মান' বলে কথা! আসলে বিষয়টি আদৌ সেরকম ছিল না। গরু-মোষের চামড়া ফুটো করা সাধারণ শকুনদের (White-rumped vulture) পক্ষে মোটেই সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু রাজকীয় রাজশকুনের ঠোঁট বেশি ধারালো-তীক্ষ্ণ ও শক্তপোক্ত হওয়ায় চামড়া ফুটো করে মাংস খাওয়াটা তার জন্য সহজ কাজ ছিল। চামড়া ফুটো করে রাজকীয় শকুনটি যখন মাংস খাওয়া শুরু করেছে, তখনি তার কাছে গিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করলে রেগে যেতে পারে। অতএব, প্রজা শকুনদের অপেক্ষা। রাজা পেট পুরে খেয়ে সরে দাঁড়াল বা উড়াল দিল তখন হামলে পড়ত অন্যরা। চামড়া তুলে ফেলা তখন ওদের পক্ষে কোনো ব্যাপারই ছিল না।

সেই রাজশকুন এখন বিলুপ্ত বাংলাদেশ থেকে। বিলুপ্তপ্রায় এখন সাধারণ শকুনরাও। শকুনরা এখন কোণঠাসা অবস্থায় টিকে আছে বৃহত্তর সিলেট ও বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলে। শকুন– এইতো সেদিনও ছিল। এখন নেই রাজশকুনরা, নেই হতে চলেছে সাধারণ শকুনরাও। এই যে নেই হওয়া, তার কয়েকটি প্রধান কারণের ভেতর অন্যতম কারণটি হচ্ছে প্রকট খাদ্যসংকট। ১৯৭০ সালের পর থেকে পশু চিকিৎসার অভাবিত উন্নতি ঘটেছে, গবাদিপশু এখন আর মরেই না বলতে গেলে। মরার আগেই 'মর মর' গরু-মোষ গোপনে মাংস হয়ে চালান হয়ে যায় হাটবাজারে, মাংস ঝুলে থাকে কসাইয়ের দোকানে। ক্বচিৎ মারা গেলে আজকাল স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য মাটি চাপা দেওয়া হয়।

শকুনরা তাহলে খাবে কী? এমনিতে আশ্রয়-বৃক্ষ বা বাসা বেঁধে

শকুন

ডিম-ছানা তোলার মতো পরিবেশ আজতক (২০১৭) বহাল আছে বাংলাদেশের প্রকৃতিতে। শকুনদের মানুষ মারত না, ধরত না– ওদের নেই বা ছিল না কোনো মাংসমূল্য। পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা থাকলে অবশ্যই শকুন টিকে থাকত।

রাজশকুন খুলনা-যশোর-ফরিদপুর-বরিশালের বাগেরহাট সীমান্ত অঞ্চল ও বাগেরহাট অঞ্চলে পরিচিত ছিল মোরগশকুন নামে। রাজা শকুন আর দারোগা শকুনও বলত কেউ কেউ। সেই শকুনটিকে আমি (বয়স এখন ৬৭ বছর) দেখলাম, আমার সন্তানরা দেখেনি। আমার কাছ থেকে তারা নামটি শুনেছে। তারা চলে গেলে আর কেউ জানবে না নামটিও। ইতিহাস হয়ে যাবে পাখিটি। এভাবে ইতিহাস হয়ে যাবে বা যাচ্ছে বাংলাদেশের আরো কিছু আবাসিক ও পরিযায়ী পাখি।

প্রকৃতির নিয়মে যদি একটি পাখি হারিয়ে যায় বাংলাদেশ বা বিশ্ব থেকে, সেটি মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু মানুষের কারণে বা সভ্যতা-শিল্প বিকাশের অজুহাতে যদি বিশ্ব বা বাংলাদেশ থেকে একটি পাখি ইতিহাস তথা বিলুপ্ত হয়ে যায়, মেনে নেওয়া যায় না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিষয়টি পুরোপুরিই মনুষ্য সৃষ্ট।

আমাদের দেশ থেকে ইতোমধ্যে বিলুপ্ত পাখিদের তালিকা

ভাদিহাঁস (White-winged Duck) : দৈর্ঘ্য ৬৬-৮১ সেমি.। বৈজ্ঞানিক নাম Cairina seutulata। এরা বাস করত গভীর পার্বত্য বনে (বৃহত্তর চট্টগ্রাম), থাকত ও বাসা করত বড়ো বড়ো গাছে, যেমন– আম, সিভিট ইত্যাদি গাছের খোঁড়ল বা ফোকরে। ছানারা ডিম ফুটে বেরুনোর পর ঝরনা-ছড়া-হ্রদ-জলাশয়ের কাছে লাফিয়ে নামত উঁচু থেকে, তারপর নামত জলাশয়ে। ক্ষুদ্র জাতিদের ডিম-ছানা চুরি করা ও জলে ভাসমান পাখি শিকারই বড়োসড়ো এই হাঁসটির বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। দেখতে ও গড়নে এরা ছিল পোষা চিনাহাঁসের মতোই অনেকটা।

ময়ূর (Indian Peafowl) বা নীল ময়ূর : আশির দশকেও টিকে ছিল বাংলাদেশের শালবন ও পাহাড়ি বনে। বিলুপ্ত এখন। তবে, জীবন্ত ইতিহাস হিসেবে দেশের চিড়িয়াখানাগুলোতে যথেষ্টই আছে। বনেও ছিল। মানুষ ওদেরকে হত্যা করেছে দর্শনীয় ও মনোমুগ্ধকর লেজ, পালকের জন্য। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা মেরেছে মাংসের জন্য। শখ করে পোষার জন্যও কেউ কেউ ডিম-ছানা চুরি করেছে। মুরগির তা-য়ে ডিম ফুটিয়ে ছানা পুষতে চেয়েছে।

পুরুষ ময়ূরের দৈর্ঘ্য ১০০-২৩০ সেমি. ও মেয়ে ৯০-১০০ সেমি.। ওজন ৪-৬ কেজি। খাবার তালিকায় আছে নানান রকম ঘাসের বীজ ও শস্যদানা, কেঁচোসহ মাটি ও মাটির উপরিভাগের নানারকম পোকামাকড়, সাপ, গিরগিটি, ছোটো ইঁদুর, তক্ষক ইত্যাদি। ঘন ঝোপের তলায় গাছের পাতার ডাঁটি ও লতা-শিকড় দিয়ে বাসা বানায় এরা। ডিম পাড়ে ৪-৬টি। ডিম ফুটে ছানা হয় ২৮ দিনে।

পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর এই পাখিটি পাশের দেশ ভারতের জাতীয় পাখি। বহাল তবিয়তে টিকে আছে ওই দেশে, টিকে আছে মিয়ানমারসহ আরো বেশ কিছু দেশে।

বর্মি ময়ূর (Green Peafowl) : ১৯৯৫ সাল পর্যন্তও বাংলাদেশে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল এই সুদর্শন ময়ূরটি। এটির বৈজ্ঞানিক নাম Pavo Muticus. দৈর্ঘ্য ১৮০-৩০০ সেমি. মেয়ে ১০০-১১০ সেমি.। এটিরও ইতিহাস পুরুষের ময়ূরের নীল ময়ূরদের মতো। বিলুপ্তের কারণ ওই একই।

গোলাপি শির হাঁস (Pink-headed Duck) : দেশের বৃহত্তর সিলেট-চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগে কোনোরকমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত। এটির বৈজ্ঞানিক নাম Rhodonessa caryophyllacea. দৈর্ঘ্য ৬০ সেমি.। ওজন ১ কেজি। মূল খাদ্য ছিল– জলজ উদ্ভিদ, কচি ডগা-পাতা, কুঁচো, চিংড়ি, ছোটো শামুক ইত্যাদি। ডিম পাড়ত ৫-১০টি। এই হাঁসটি বর্তমানে পৃথিবী থেকেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

হাড়গিলা (Greater Adjutant) : বৈজ্ঞানিক নাম Leptoptilos dubius। দৈর্ঘ্য ১২০-১৫০ সেমি.। ওজন ৪-৮ কেজি। মূল খাদ্য মৃত পশুর মাংস, মাছ, ব্যাঙ, ইঁদুর ইত্যাদি। ১৯৬০ সালেও পশ্চিম বাংলার কলকাতা পৌরসভার প্রতীক ছিল এই হাড়গিলা পাখি। এদের গলায় কচি লাউ, বেগুন বা বেলুনের মতো একটি চামড়ার থলে ঝুলে থাকে। প্রয়োজনে ওটা ভেতরে টেনে নিয়ে অদৃশ্য করে ফেলতে পারে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে হামলে পড়েছিল– চালিয়েছিল হত্যাযজ্ঞ, তখন টানা ন'বছর ধরে চারুকলায় বসবাসকারী একটি 'মুক্ত পোষা' হাড়গিলা পাখিও নিহত হয়েছিল। ওটিকে চারুকলায় এনেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন। মুক্ত পোষা পাখি হলো সেগুলো– বুনো যে পাখিকে খাঁচাবন্দি না করেও ছেড়ে দিয়ে পোষা যায়।

হাড়গিলা

হানাদারদের গুলিতে ঝাঁঝরা হবার আগে সেই হাড়গিলা পাখিটা প্রবল বিক্রমে উড়ে গিয়ে দুজন খান সেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ওটি তাই 'মুক্তিযোদ্ধা হাড়গিলা' পাখি। হাড়গিলারা বাংলাদেশে আশির দশকেও ওদের অস্তিত্ব সংগ্রামে লিপ্ত ছিল বড়ো বড়ো নদীচর ও সুন্দরবনে।

মদনটাক (Leptoptilos Javanicus): এককালে সারাদেশে দেখতে পাওয়া যেত মদনটাক, এরা হাড়গিলা জাতের পাখি। তারা এখন কোণঠাসা বলতে গেলে সুন্দরবনেই। কবে জানি ওরাও ইতিহাস হয়ে যায়! বৈজ্ঞানিক নাম Leptoptilos javanicus। দৈর্ঘ্য ১১৫-১২০ সেমি., ওজন সাড়ে চার কেজি। মূল খাদ্য মাছ, ব্যাঙ, ছোটো সাপ। উঁচু গাছের মগডালে ডালপালা দিয়ে মাচানের মতো বাসা করে। ডিম হয় ৩-৪টি। ডিম ফুটে ছানা হয় ২৮-৩২ দিনে।

মদনটাক

ডাহুক (Bengal Florican) : ঘাড়, মাথা, গলা, বুক কালো। সুদর্শন এই পাখিটি তার অস্তিত্বের লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল ১৯৭০ সাল পর্যন্ত। ছিল রংপুর-সিলেট-কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে। দৈর্ঘ্য ৬৪-৬৮ সেমি.। ওজন দেড় থেকে সোয়া দুই কেজি পর্যন্ত। মূল খাদ্য কীটপতঙ্গ, গিরগিটি, তক্ষক, ছোটো সাপ, কচি ঘাস, পাতা, নানারকম শস্যবীজ ও ফল। বাসা করে মাটিতে, ঘাসের জঙ্গলে। ডিম পাড়ে ১-২টি। ডিম ফুটে ছানা হয় ২৫-২৮ দিনে। অন্যান্য দেশে টিকে থাকলেও বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত।

অন্যান্য বিলুপ্তপ্রায় পাখি ঃ আরো কয়েকটি পাখিকে বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ধরে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাদের দেখা মিলেছে আবার আমাদের দেশে। যেমন– মানিকজোড়।

২০১৫-২০১৬ সালে রাজশাহীর পদ্মার চরে দেখা মিলেছে মানিকজোড়ের। বাগেরহাট অঞ্চলে আজও শীত মৌসুমে ২-৪টি করে মানিকজোড়ের দেখা মেলে। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে একজোড়া মানিকজোড়ের একটি নিহত হয়েছিল বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার সাতশৈয়া গ্রামে।

রামশালিক (Black-necked Stork), কালাজাঙ (Black Stork), রঙিলা বক (Painted Stork) বিলুপ্ত প্রায় পাখির তালিকাভুক্ত থাকলেও গত তিন বছরে রাজশাহীর পদ্মার চরে দেখা মিলেছে এদের। উল্লিখিত ৪ প্রজাতিরই দেখা মিলত সারাদেশে– ১৯৬৫-৭০ সাল পর্যন্ত। মানিকজোড়, রামশালিক, কালাজাঙ ও রঙিলা বক খোলা মাঠ, জলাশয়, হাওর, বাঁওড়ের পাখি। অনেক বড়ো পাখি হওয়ায় এরা সহজে নজরে পড়ে যায় সাধারণ মানুষ ও বন্দুক শিকারিদের। মাংসমূল্য যথেষ্ট এদের। এদেশ থেকে এদের বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যাওয়ার পেছনে মূল কারণ দুটি হলো– শিকার ও আবাসস্থল তথা চারণক্ষেত্রের সংকট। সরকারি আইনে এগুলো মারা-ধরা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ থাকলেও কোনো কাজ হচ্ছে না।

কালাজাং

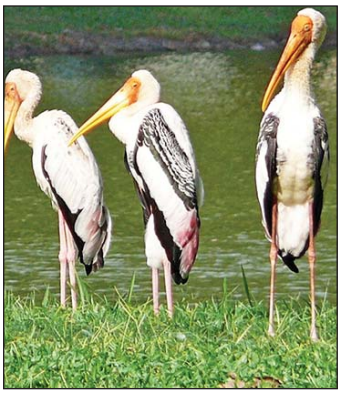

রঙিলা বক

মানিকজোড় ৬০ দশক পর্যন্ত আমাদের আবাসিক পাখি ছিল। এদের দৈর্ঘ্য ৯০-১২৫ সেমি.। ওজন সাড়ে তিন কেজি। ইংরেজি নাম Woolly-necked Stork.

রামশালিকের দৈর্ঘ্য ১২৮-১৫০ সেমি। ওজন ৪ কেজির বেশি। কালাজাঙের দৈর্ঘ্য ৯০-১০০ সেমি.। ওজন ৩ কেজির বেশি। রঙিলা বকের দৈর্ঘ্য ৯৩-১০২ সেমি.। ওজন সাড়ে তিন কেজি পর্যন্ত হতে পারে। উল্লিখিত ৪টি পাখি পরিযায়ী। পরিযায়ী আরেকটি বিশাল পাখি ৭০-৮০ দশকেও দেখা মিলত যেটির, সেটির নাম সাদা গগনবেড়। জলাশয়ের পাখি, রং সাদা, আকারে বিশাল। অতএব, শিকার হতো বন্দুকের। এখন (২০১৭) বিলুপ্ত। সাদা গগনবেড়ের ইংরেজি নাম Great White Pelican। দৈর্ঘ্য ১৪০-১৮০ সেমি.। ওজন ৯-১৫ কেজি। এছাড়া সারসও দেখা যেত ৬০-৭০ দশকে, এখন বিলুপ্ত। ধূসর সারস (Demoiselle Crane) বিলুপ্ত ছিল, কিন্তু ২০১০ সালে সিলেটের হাওরে বন্দুকের গুলিতে মারা পড়েছিল একটি, শিকারি পাকড়াও হয়েছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে। ধূসর সারসের দৈর্ঘ্য ৯০-১০০ সেমি.। আর সারসের ইংরেজি নাম Sarus Crane. দৈর্ঘ্য ১৫৬ সেমি.। এছাড়া সাদা মানিকজোড় (Oriental Stork) আসত প্রতি শীতে।

মানিকজোড়

সাপ পাখি

সংখ্যায় খুবই কম। ২০০৮-০৯ সালেও বাগেরহাটের চিতলমারী-ফকিরহাট-মোল্লারহাট ও খুলনা জেলার রূপসা-তেরখাদা জুড়ে বিশাল 'উত্তরের হাওরে' দেখা গিয়েছিল একজোড়া, (১৯৯৬ থেকে শুরু করে ২০০৯ সাল পর্যন্ত প্রতি শীতে) আর দেখা মেলেনি। সাদা মানিকজোড়ের দৈর্ঘ্য ১১০-১৫০ সেমি.। কালো তিতির (Black Francolin) এককালে দেশের বেশ কয়েকটি স্পটে থাকলেও এখন একেবারেই কোণঠাসা পঞ্চগড়ের সীমান্তে। এদের দৈর্ঘ্য ৩৪ সেমি.।

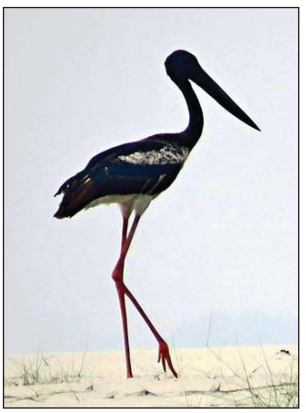

লোহারজাং

উপরে উল্লিখিত পাখিগুলো ছাড়াও যেসব পাখি প্রায় বিপদগ্রস্ত, সংকটাপন্ন বা মহাবিপন্ন হিসেবে বিবেচিত এদেশে, সেগুলো হলো কাস্তেচরা বা ধলবদনী, ধূসর রাজহাঁস, কুড়াবাজ, বজ্রমুড়ি বা লালমাথা হাঁস, জলখোর, সাপ পাখি, কাঠমৌর, বাঁশবনের তিতির, নাকতা হাঁস, পান্তামুখী হাঁস, কিয়া বা জলার তিতির সহ আরো কিছু পাখি। এর ভেতর কুড়াবাজ বাদে অন্য সবগুলো পাখির বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় অথবা সংকটাপন্ন বা বিপন্ন হওয়ার মূল কারণ শিকার– মাংসলোভী মানুষ। আবাসস্থলের সংকটও এর সাথে যুক্ত অঙ্গাঙ্গীভাবে। কুড়াবাজের মূল খাদ্য মাছ। হাওর অঞ্চল ছাড়া এদেরকে মাছ খাওয়ার অপরাধে (?) গুলি খেয়ে মরতে হয়।

কয়েকটি পাখির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কাস্তেচরা : এটির ইংরেজি নাম Black-headed Ibis। দৈর্ঘ্য ৬৫-৭৫ সেমি.। ওজন প্রায় দেড় কেজি। হাওর, বাঁওড়, বিল, জলাশয়ের পাখি এটি।

ধূসর রাজহাঁস : ইংরেজি নাম Greylag Goose। দৈর্ঘ্য ৭৫-৯০ সেমি.। দেখতে আমাদের পোষা রাজহাঁসের মতো। রং, আকার, গড়ন, ধরন ও ওজন একই রকম। ধারণা করা হয়, এরাই পোষা রাজহাঁসের আদি পিতামাতা। আমাদের দেশে এরা শীতের পরিযায়ী পাখি ।

রাজহাঁস : ধূসর রাজহাঁসের চেয়ে অল্প ছোটো। ইংরেজি নাম Bar-headed Goose। দৈর্ঘ্য ৭১-৭৬ সেমি.।

কুড়াবাজ : ইংরেজি নাম Palls's Fish Eagle। দৈর্ঘ ৭০-৮৪ সেমি.। ওজন সাড়ে তিন কেজির বেশি। মূল খাদ্য মাছ।

বজ্রমুড়ি হাঁস : শীতের পরিযায়ী সুন্দর এই বুনোহাঁসটির ইংরেজি নাম Red-crested pochard। দৈর্ঘ্য ৫৫ সেমি.। ওজন ৯৮০ গ্রাম।

জলখোর : পানিকাটা পাখি নামে বেশি পরিচিত এটি। ইংরেজি নাম Indian Skimmer। দৈর্ঘ্য ৪০ সেমি.। ২০১৭ সালে অকস্মাৎ একটি ঝাঁককে (প্রায় ২০০ পাখি) রাজশাহীর পদ্মার চরে দেখা গিয়েছিল। ডিম-ছানাও তুলেছিল। তবে, হতভাগারা ডিম-ছানা রক্ষা করতে পারেনি।

কুড়াবাজ

সাপ পাখি : ইংরেজি নাম Oriental Darter। দৈর্ঘ্য ৯০ সেমি.। ওজন দেড় কেজি। এটি আমাদের দুর্লভ আবাসিক পাখি। বাসা করে গাছের ডালে। ডিম পাড়ে ৫-৬টি। ডিম ফুটে ছানা হয় ২৪-২৬ দিনে।

কাঠমৌর : গভীর পাহাড়ি বনের পাখি। ইংরেজি নাম Grey Peacock Pheasant। দৈর্ঘ্য পুরুষ ৬৪ সেমি., মেয়ে ৪৮ সেমি.। ওজন ৭৩০ গ্রাম।

ধূসর রাজহাঁস

বাঁশবনের তিতির : বিলুপ্ত। বসবাস ছিল পাহাড়-টিলাময় বনের বড়ো বড়ো বাঁশমহালে। ইংরেজি নাম Bamboo Partridge।

নাকতা হাঁস : ইংরেজি নাম Comb Duck। দৈর্ঘ্য ৫৬-৭৬ সেমি।

পান্তামুখী হাঁস : ইংরেজি নাম Northern Shoveler. দৈর্ঘ্য ৪৪-৫২ সেমি.।

কিয়া বা জলার তিতির : ইংরেজি নাম Swamp Partridge।

রাজহাঁস

যে-কোনো পাখির টিকে থাকার জন্য ৪টি মৌলিক সুবিধা অনিবার্য প্রয়োজন। ক) নিরাপদ আবাসভূমি খ) খাদ্য গ) নিরাপত্তা ও ঘ) বাসা বেঁধে নির্বিঘ্নে ডিম পেড়ে ছানা তোলার সুবিধা, ছানাদের বড়ো করে তোলার সুবিধা। এই ৪টি প্রয়োজনের যে-কোনো একটির ঘাটতি পড়লে পাখিরা সংকটে পড়ে যায়– যারা কিনা প্রকৃতির উড়ন্ত-দুরন্ত সুন্দর ও পরিবেশের অকৃত্রিম বন্ধু। এদেশকে বাঁচাতে বন্যপ্রাণী আইন ২০১২- এর ব্যাপক প্রচার ও প্রয়োগ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার।

লেখক : পাখি গবেষক ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

দেশে দেশে নববর্ষ উদ্‌যাপন

সুলতানা বেগম

নববর্ষ হচ্ছে নতুন বছরের শুরু। পৃথিবীর প্রায় সব জাতিই নানাভাবে নববর্ষ উদ্‌যাপন করে। নববর্ষের মূল চেতনা হচ্ছে পুরাতন বছরের ক্লান্তি , দুঃখ ও গ্লানিকে ধুয়ে-মুছে জড়তা ও ব্যর্থতাকে পেছনে ফেলে মানুষ নতুনের স্বপ্ন রচনা করে। মানুষের এই চিরন্তন প্রত্যাশাকে জাগ্রত করে তোলে নববর্ষ। এসময় পুরাতনকে বিদায় করে নতুনকে স্বাগত জানানোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কেবল আনন্দ আর উৎসবের সময় চলে যায় তা নয়, পরস্পরের মধ্যে ভালোমন্দ, সহমর্মিতা আর হৃদয়ের বন্ধনও তৈরি হয়। একে অপরকে নানা ধরনের উপহার সামগ্রী দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েও সময়টাকে অর্থবহ করে তোলে সবাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে উদ্‌যাপিত হয় নববর্ষ। দেশীয় সংস্কৃতি , জনগণের অনুভূতি, আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বরণ করে নববর্ষকে। নিম্নে দেশে দেশে নববর্ষ পালনের রীতিনীতি তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশ

পয়লা বৈশাখ বাংলা সনের প্রথম দিন। বাংলাদেশে নববর্ষ হিসেবে পালন করা হয় পয়লা বৈশাখকে। এই দিনটি বাঙালিদের একটি সার্বজনীন লোক উৎসব হিসেবে বিবেচিত। বাঙালির গ্রাম্য ও নগর জীবনে নববর্ষ আসে নানা অনুষ্ঠান আর উৎসবের ডালা সাজিয়ে। এই দিনে বাংলার প্রতিটি ঘর মুখর হয়ে ওঠে নতুন আনন্দে, নতুন উদ্দীপনায়। গৃহকোণ হয়ে ওঠে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মানুষ এই দিনে ভোরে ঘুম থেকে ওঠে, নতুন জামা-কাপড় পরে এবং আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে বেড়াতে যায়। একে অপরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে এবং পুরনো বিভেদ ভুলে গিয়ে সকলের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করে। নববর্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান হচ্ছে হালখাতা ও মেলা। হালখাতা হচ্ছে নতুন হিসাব বই। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা কেন্দ্র ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে পুরাতন বছরের লেনদেন, লাভক্ষতির হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে নতুন বছরের হিসাব রাখার জন্য খোলেন হালখাতা। দোকানি ও ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের দই, চিড়া এবং মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করে। এর মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক সৌহার্দ্যের সৃষ্টি হয় এবং ব্যবসায়ী মহলে আবার নতুন উদ্যমে বিক্রি শুরু হয়। এই প্রথাটি গ্রামে এবং শহরের অনেকাংশে প্রচলিত আছে। নববর্ষের মেলা দেশের এমন কোনো জেলা-উপজেলা নেই যেখানে না বসে। মেলা হচ্ছে বাঙালি সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অপরিহার্য অঙ্গ। এই মেলা বাঙালি চেতনাকে উজ্জীবিত করে এবং এটি মূলত সার্বজনীন লোকজ মেলা। মেলায় শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতীসহ পরিণত মানুষের বিশাল সমাগম ঘটে। মেলায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত এবং মৃৎশিল্পের হরেকরকম পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি ছাড়াও আগতদের মনোরঞ্জনের জন্য নানা ব্যবস্থা থাকে। থাকে নানারকম পিঠা-পুলি, মিষ্টি, মুড়ি-মুড়কির আয়োজন। মেলা পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন ইতিবাচক ভূমিকা রাখে তেমনি স্থানীয় সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্ব অনেক। পান্তা-ইলিশ নববর্ষ উৎসবের আর একটি উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ। মাটির সানকিতে করে পান্তা-ইলিশ না খেলে নববর্ষ উৎসব যেন পানসে লাগে। এর সাথে নানারকম ভর্তা, ঘন ডাল, ভাজা মরিচও যোগ হয়। নববর্ষের এই দিনে দেশের অনেক জায়গায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে নৌকা বাইচ, লাঠিখেলা কিংবা কুস্তি উল্লেখযোগ্য। পয়লা বৈশাখে সূর্যোদয়ের পর পর ছায়ানটের শিল্পীরা রমনার বটমূলে সম্মিলিত কণ্ঠে গান গেয়ে নতুন বছরের নতুন সূর্যকে আহ্বান জানান। ষাটের দশকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন ও সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ১৯৬৭ সাল

বৈশাখি মেলায় গ্রামবাংলার লাঠিখেলা

থেকে ছায়ানটের এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সূচনা। মঙ্গল শোভাযাত্রা নববর্ষের আরেকটি আবশ্যিক উৎসব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে পয়লা বৈশাখের সকালে এই শোভাযাত্রাটি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রায় গ্রামীণ জীবন এবং আবহমান বাংলাকে ফুটিয়ে তোলা হয়। বিভিন্ন রঙের মুখোশ ও প্রাণীর প্রতিকৃতি বানানো হয় শোভাযাত্রার জন্য। সকল শ্রেণি-পেশার বিভিন্ন বয়সের মানুষ অংশগ্রহণ করে শোভাযাত্রায়। ১৯৯৮ সাল থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রা নববর্ষে একটি অন্যরকম আকর্ষণ হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। পয়লা বৈশাখে বাঙালি ললনারা তাদের ঐতিহ্য ধরে রাখতে লাল পাড়ের সাদা রঙের মধ্যে বাহারি কাজ করা শাড়ি পরে আর ছেলেরা সাদা রঙের মধ্যে বাহারি কাজ করা নতুন পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে পালন করে নববর্ষ। নববর্ষে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ছুটি থাকে।

ভারত

ভারতে নববর্ষ পালন করা হয় বাংলা নববর্ষারম্ভ পয়লা বৈশাখে। দিনটি বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। গ্রামীণ এবং নাগরিক জীবনের মেলবন্ধন সাধিত হয়ে সকলে একসূত্রে বাঁধা পড়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর জন্য। সেখানকার বহু পরিবারে বর্ষ শেষের দিন চৈত্র সংক্রান্তিতে টক এবং তিতা ব্যঞ্জন ভক্ষণ করে সম্পর্কের তিক্ততা ও অম্লতা বর্জন করার জন্য। পয়লা বৈশাখের দিন প্রতিটি পরিবারে স্নান সেরে বড়োদের প্রণাম করার রীতি বহুল প্রচলিত। বাড়িতে বাড়িতে এবং সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চলে মিষ্টান্ন ভোজন। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায়িক হিসাবের নতুন খাতার উদ্‌বোধন করা হয়, যার প্রতীকী নাম 'হালখাতা'। সকলের মঙ্গল কামনা করে দেবির আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়। কলকাতায় বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন পাড়ায় প্রভাতফেরির আয়োজন করা হয়। সেখানকার মানুষ নববর্ষে নতুন জামাকাপড় পরে।

মিয়ানমার

মিয়ানমারদের বর্ষ শুরু হয় জুলাই মাসে। ব্যাপক উৎসাহে তারা নববর্ষ উদ্‌যাপন করে। প্রথা অনুযায়ী তারা প্রতি নববর্ষে আলাদা দেবির উপাসনা করে। এসময় তারা মন্দিরগুলো নীল রঙে সাজায়। তাদের কাছে নীল রং পবিত্রতার প্রতীক। নববর্ষে মিয়ানমাররা একে অন্যের গায়ে পানি ছুড়ে মারে। এভাবে পানিতে ভিজে যাওয়াকে তারা আত্মশুদ্ধির অভিযান মনে করে। নতুন পোশাক পরা, বিশেষ খাবার খাওয়া, নাচগান উৎসব করে থাকে এই দিনে। তাদের আরেকটি প্রধান রীতি হচ্ছে নববর্ষে পুরনো মাটি ও কাঁচের জিনিস ভেঙে ফেলা। এর মাধ্যমে তারা তাদের গৃহকে নতুন করে তোলে।

কোরিয়া

কোরিয়ায় নববর্ষ পালন করা হয় চন্দ্রমাস অনুযায়ী শীতের দ্বিতীয় চাঁদ ওঠার দিন। কোরিয়ার জনগণ নতুন বছরকে 'সোল-নাল' বলে। এই দিন তারা ঘরের সামনে খড়কুটা, বেলচা, চালুনি ও কোদাল রেখে

দেয়। তাদের ধারণা এগুলো পরিবারকে নতুন বছরে শয়তান ও পাপ কাজ থেকে রক্ষা করবে। নতুন কাপড় পরে ছোটোরা বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে। এই দিনকে সামনে রেখে প্রত্যেকটি বাড়ি, দোকান এবং অফিস-আদালত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। তারা সবাই মিলে 'টুক্কুক' নামক সুপ খায় চাউলের পিঠা দিয়ে। তাদের বিশ্বাস , সুপ খেলে বয়স বাড়ে। সেখানকার অনেকেই বয়সের হিসাব করে নববর্ষ থেকে, জন্ম তারিখ ধরে নয়। এই দিনে 'চইয়ং' নামে একটি নাচের অনুষ্ঠান হয়। সেখানে মুখোশ পরে নৃত্য পরিবেশন করা হয়।

থাইল্যান্ড

ইংরেজি বর্ষপঞ্জিকা অনুযায়ী থাইল্যান্ডে ১৩-১৫ই এপ্রিল 'সংক্রান' নামে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে এ উৎসব পালন করে থাই নাগরিকরা। এ সময় তারা একে অন্যের গায়ে পানি ছিটিয়ে 'পানি উৎসব' পালন করে। তারা পানি ছিটানোর মাধ্যমে বিশুদ্ধ হতে চায়।

আর্জেন্টিনা

আর্জেন্টাইনরা অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে তাদের নববর্ষ পালন করে। নববর্ষের আগের রাত বারোটা বাজলেই তারা রাস্তায় নেমে পড়ে নববর্ষকে বরণ করতে। আতশবাজি চলে চারদিকে। বড়োরা নাচের অনুষ্ঠানে যায় এবং ভোর পর্যন্ত চলে নৃত্য পরিবেশন। নববর্ষের দিন সকালে আর্জেন্টাইনরা সাঁতার কাটার জন্য ভিড় করে নদীতে কিংবা লেকের পাড়ে। সাঁতার কাটা নববর্ষ পালনের অন্যতম অনুষঙ্গ। আর্জেন্টাইনরা 'বিন' নামে এক ধরনের সবজি খায় নববর্ষে। তারা মনে করেন সবজি খাওয়া তাদের বর্তমান চাকরিকে স্থায়ী করবে এবং ভবিষ্যতে আরো ভালো চাকরির সুযোগ আসবে। নতুন বছরে অনেক বেশি ভ্রমণের আশায় তারা সুটকেট নিয়ে বাড়ির চারদিকে দৌড়ায়।

ব্রাজিল

ব্রাজিলে বিপুল উৎসাহ ও কৌতূহলের মধ্য দিয়ে পালিত হয় নববর্ষ। রিওডি জেনিরো সমুদ্রসৈকতে নববর্ষের সবচেয়ে বড়ো অনুষ্ঠানটি হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ চোখ ধাঁধানো আতশবাজির প্রদর্শনী। ব্রাজিলিয়ানদের বিশ্বাস, এই দিন তাদের জীবনে সৌভাগ্য ও সুযোগ বয়ে আনে। ব্রাজিলের অধিকাংশ লোকই সাদা পোশাক পরিধান করে সৌভাগ্যের রং মনে করে। তারা সমুদ্রে ৭ টি ডুব এবং ৭টি ফুল ছুড়ে দেয় বছরটি ভালো কাটার আশায়। তাদের আরেকটি অন্যমত রীতি সমুদ্রসৈকতে মোমবাতি জ্বালানো। তাদের ধারণা, এরফলে সমুদ্রে থাকা দেবী তাদের ইচ্ছা পূরণ করবে।

সুইজারল্যান্ড

সুইজারল্যান্ডে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয় ১৩ই জানুয়ারি। নববর্ষে সুইজারল্যান্ডবাসী নতুন জামা পরে রাস্তায় নেমে আসে, পরস্পর উপহার আদান-প্রদান করে, শুভেচ্ছা বিনিময় করে এবং পরিবারের সঙ্গে বিশেষ খাবার গ্রহণ করে। এছাড়া সুইজারল্যান্ডে ১লা জানুয়ারিও ব্যাপক আকারে নববর্ষ পালিত হয়।

ভিয়েতনাম

ভিয়েতনামে নববর্ষকে 'টেট' শব্দে অভিহিত করা হয়। ভিয়েতনামীরা নববর্ষে নদী বা পুকুরে কার্প মাছ ছাড়েন। কার্প মাছের পিঠে করে ঈশ্বর ভ্রমণে বের হন এই বিশ্বাসে। এছাড়া প্রতি নববর্ষে ভোর হওয়ার সময় সবাই গুরুজনদের কাছে দীর্ঘায়ু কামনা করে আশীর্বাদ নেয়।

ইরান

ইরানে ২১শে মার্চ ব্যাপক আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করে নববর্ষ। যার নাম 'নওরোজ'। শহর ও গ্রামে সমান তালে এই উৎসব পালিত হয়। নববর্ষে ইরানিরা ঘরবাড়ি, দোকানপাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে এবং নতুন কাপড় পরে। তারা পার্টিতে অংশগ্রহণ করে ও বিশেষ খাবার খেয়ে সারারাত উৎসব পালন করে। কৃষকরা ক্ষেতে বপন করে বিভিন্ন শস্যের বীজ। এছাড়া 'হাফত-সিন' নামের বিশেষ খাবার এই দিনের সার্বজনীন খাবার, যা সাত রকমের উপকরণে তৈরি করা হয়।

রাশিয়া

রাশিয়ায় নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয় জানুয়ারির প্রথম ১০ দিন। নববর্ষে রাশিয়ানরা তাদের বাড়িঘর পাইন গাছের শাখা দিয়ে সাজায়। রাশিয়ার নববর্ষ বৃক্ষ হচ্ছে 'নভোগদনায়া ইয়লকা'। নববর্ষে এই গাছকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়। এই সময় তারা গোশত, আলু, শশা, মটর, গাজর দিয়ে তৈরি 'অলিভি সালাদ' নামে বিশেষ এক ধরনের খাবার খেয়ে থাকে। এছাড়া শ্যামপেইন খাওয়া এবং আতশবাজির প্রদর্শনী নববর্ষ পালনের অন্যতম রীতি।

চীন

চীন দেশে পূর্ণিমার শুরুর দিন থেকে শুক্ল পক্ষের পনেরো দিন নববর্ষ উৎসব পালন করা হয়। চীনারা জানুয়ারির প্রথম দিনকে নববর্ষ হিসেবে পালন করে না। বৈশাখের কাছাকাছি নতুন বছর শুরু হয়। নববর্ষে চীনারা তাদের বাড়িঘর লণ্ঠনের আলোয় সুসজ্জিত করে। নববর্ষের প্রথম দিন তারা স্বর্গ ও পৃথিবীর দেবতাকে তুষ্ট করে নানান উপাসনা-উপাচারে, দ্বিতীয় দিন পূর্বপুরুষের মঙ্গল কামনা করে এবং সপ্তম দিন পালন করে শস দিবস নামে। এই দিন তারা 'ওয়েইলু' নামক বিশেষ ভোজনের আয়োজন করে । নববর্ষ প্যারেড চীনাদের আরেকটি আনুষ্ঠানিকতা । রাস্তায় দাঁড়িয়ে তারা এই প্যারেড করে। লায়ন ও ড্রাগন নৃত্য তাদের অন্যতম রীতি। তাদের কাছে ড্রাগন হচ্ছে দীর্ঘ জীবন ও সম্পদের প্রতীক আর লায়ন হচ্ছে বীরত্বের প্রতীক।

যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্যের লন্ডনে নববর্ষ উদ্‌যাপন করে জানুয়ারির প্রথম দিন। সেখানকার ছেলেমেয়েরা নববর্ষের দিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রতিবেশীদের বাড়িতে গান গাইতে গাইতে যায়। প্রতিবেশীরা তাদের হাতে দেয় আপেল, মুখে মিষ্টি আর পকেটে দেয় পাউন্ডের চকচকে মুদ্রা। নববর্ষের দিন অনেক মেয়ে সকালের প্রথম প্রহরে ডিমের সাদা অংশ ছেড়ে দেয় পানিতে, সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ে হবে বলে । এছাড়া তারা মনে করে বছরের প্রথম দিনে যে মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে তার যদি লাল চুল হয় এবং সে যদি অসুন্দর মহিলা হয় তবে বছরটি হবে অবশ্যই দুর্ভাগ্যের । কালো চুলের অধিকারী, রুটি, টাকা অথবা লবণ নিয়ে আসা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম দেখা হলে বুঝতে হবে বছরটি হবে আনন্দঘন, বেদনার হবে অবসান।

জাপান

জাপানিরা জানুয়ারির প্রথম দিনকে নববর্ষ হিসেবে পালন করে। নববর্ষকে জাপানিরা 'উষাগাটসু' বলে। এই দিন রাতে মন্দির থেকে ১০৮ বার উচ্চস্বরে ঘণ্টা বাজানো হয়, যাতে শয়তানের হাত থেকে মানুষ বাঁচতে পারে। নববর্ষের দিন সকল দোকানপাট, কলকারখানা এবং অফিস-আদালত বন্ধ থাকে। জাপানিরা নতুন পোশাক পরে পরিবারের সবাইকে নিয়ে প্রচুর খানাপিনার মাঝে দিনটি পালন করে। তারা খড়কুটো দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘরের সামনে ঝুলিয়ে দেয়, ভূতপ্রেত ও শয়তানদের গৃহে প্রবেশ বন্ধ হবে বলে। অনেক জাপানিরা নববর্ষের দিন শুধু শুধু হাসতে শুরু করে, যাতে বছরটি হাসিখুশি ও আনন্দময় হয়। ২ সপ্তাহ ধরে চলে জাপানিদের নববর্ষ উদ্‌যাপন। এ সময় দুই ধরনের উৎসব চোখে পড়ে। বড়ো উৎসবে মৃতদের জন্য প্রার্থনা এবং বন্ধুদের সঙ্গে উপহার বিনিময় করা হয়। আর ছোটো উৎসবে শস্যের জন্য শস্য দেবীর কাছে প্রার্থনা করা হয়।

আমেরিকা

আমেরিকায় নববর্ষ পালন করা হয় জানুয়ারির প্রথম দিন। আতশবাজি ও নাচ-গানের মাঝে নিউইয়র্কের টাইম স্কয়ারে নববর্ষকে স্বাগত জানায় সেখানকার উৎফুল্ল জনতা। তারা গাড়িতে হর্ন বাজায়, বন্দরে জাহাজের সাইরেন বাজে মহাসমুদ্রে নাবিকদের যাত্রা হবে বলে। দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশে মধ্যরাতে নববর্ষের প্রথম প্রহরে বাড়ির জানালা দিয়ে ঘরের নোংরা পানি বাইরে ছুড়ে মারে, যেন গত বছরের সকল অশুভ শক্তি দূর হয়ে যায়।

ফিলিপাইন

ফিলিপাইনে জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে নববর্ষ পালন করা হয়। সেখানকার অধিকাংশ মানুষ তাদের পরিবারের সঙ্গে নববর্ষ পালন করে। এই দিন তারা ১২ রকমের ফল দিয়ে তৈরি এক বিশেষ ধরনের খাবার খায়। ১২ রকমের ফলকে তারা ১২ মাস মনে করে।

লেখক : সিনিয়র সাবএডিটর, সচিত্র বাংলাদেশ

প্রবন্ধ

পয়লা বৈশাখ ও ইলিশ

কাজী নুসরাত সুলতানা

বহু দিন ধরেই বৈশাখ থেকে বছর শুরুর রীতি চালু আছে। আর তাই বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিন অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ আমরা উৎসব করে যাপন করে আসছি। তবে তার ঠিক আগের দিনটি অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ দিনটিও জনজীবনের জন্য একটি বিশেষ দিন। এই দিনটিকে বলা হয় চৈত্র সংক্রান্তি। এই দিনের ধর্মীয় বা সামাজিক অন্য কোনো মাহাত্মের কথা জানা যায় না। তবে এদিন দামে বেশ ছাড় দিয়ে জিনিসপত্র বিক্রি করেন আর বিক্রি শেষে পুরনো বছরের হিসাবের খাতা বন্ধ করেন বিক্রেতারা। বৈশাখের প্রথম দিনের সকাল থেকে খোলা হয় নতুন হিসাবের খাতা, বলা হয় 'হালখাতা' অর্থাৎ বর্তমান খাতা। অনেক ক্ষেত্রে রীতিমতো নিমন্ত্রণপত্র বিতরণ করে আয়োজন করা হয় হালখাতার। আপ্যায়ন করা হয় নানারকম মিষ্টি দিয়ে। তাছাড়া মেলা বসে গ্রামগঞ্জে নানা পসরা আর আনন্দ-আয়োজন নিয়ে। সারাটা দিনই থাকে উৎসবের আবহ। ঢাকা শহরের জীবনে পয়লা বৈশাখের উৎসবে নতুন একটা মাত্রা যোগ করে 'ছায়ানট' নামক সংস্থাটি, সূর্য ওঠা ভোরে রমনার বটমূলে সংগীতানুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সেই ষাটের দশক থেকে। চারুকলা অনুষদের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উৎসবের আনন্দ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করে।

কিন্তু পয়লা বৈশাখের উৎসবের আনন্দ-আয়োজনের অনুষঙ্গ হিসেবে পান্তা-ইলিশের তো কোনো দেখা পাই না ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে! গত বেশ কয়েক বছর ধরে রমনায় গান শুনতে গিয়ে দেখছি পথের ধারে ধারে পান্তা ইলিশের দোকান। এমন তো আগে ছিল না। এই ঘটনাটির মাধ্যমে অর্থাৎ পান্তা-ইলিশ খাওয়ানোর আয়োজনে ও খাওয়ার বিস্তরণ বা বিস্ফোরণে দুটি অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে। প্রথমে খাওয়ার প্রসঙ্গে আসা যাক। পান্তাভাত আমাদের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি সহজ ও স্বাভাবিক চিরায়ত প্রায় নিত্যদিনের খাবার। রাতে রান্না করা বাড়তি ভাতে পানি দিয়ে রেখে দেওয়া হয় সংরক্ষণের উপায় হিসেবে। সাধারণত আমাদের গ্রামের মানুষেরা জলখাবার বা নাস্তা হিসেবে পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ আর নুন দিয়ে এই পান্তাভাত খেয়ে কাজে বেরিয়ে যান সাত-সকালে। শহরের মানুষের, বিশেষ করে একটু উঁচুতলার মানুষের এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের সকালের জলখাবারের ধরনধারণ আলাদা। যারা ভাত খেয়ে বেরুতে চান তারা গরম ভাত খেয়েই বের হন। সুতরাং সেইসব মানুষদের পক্ষে পয়লা বৈশাখের উৎসবের অনুষঙ্গ হিসেবে অর্থাৎ রঙ্গ করে পান্তাভাত খাওয়াটা আমাদের শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা নয়, একটা প্রচ্ছন্ন উপহাস বলে মনে হয়; এটা অন্যায় হচ্ছে বলেও মনে হয়। সেই সাথে ইলিশ ভাজা! সেটা তো কিছুতেই চলতে পারে না। বৈশাখ ইলিশের মৌসুম নয়; পাওয়া গেলেও দাম হয় ভীষণ চড়া। সাধারণ মানুষের পক্ষে কেনা দুষ্কর, অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং কিছু মানুষের অযৌক্তিক একটি কাজকে বাঙালির সংস্কৃতির অঙ্গ বলে চালিয়ে যাওয়াকে মেনে নেওয়া যায় না; এটা অপসংস্কৃতি। অপরাধও। কারণ তারা খেতে চাইছেন বলেই ওরা সরবরাহ করছেন নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। অর্থাৎ একদলকে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতে প্ররোচিত করে অন্যদল অপরাধ সংঘটিত করছেন।

এবারে খাওয়ানোর ব্যাপারটি দেখা যাক। পয়লা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ খাওয়ার প্রথা তৈরি করে যারা সেটাকে সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের অঙ্গ বলে চালিয়ে দিলেন হঠাৎ করে, তারা মোটেই ঐতিহ্যবাহী নয়। তারা চতুর ব্যবসায়ীও বটে। হুজুগ তুলে ইলিশের দাম দিলেন চড়িয়ে, আয়োজন করে পসরা সাজিয়ে খাওয়ার মুখ দিলেন দারুণভাবে বাড়িয়ে। যদি বলা হয়, 'বৈশাখে ইলিশ খাওয়ানো হচ্ছে কী করে। এটা তো মৌসুম নয়, পাওয়া তো যাবার কথা নয়। তাছাড়া নিষেধাজ্ঞাও তো রয়েছে!' জবাব আসবে– 'এগুলো তো গত মৌসুমের মাছ।' অর্থাৎ হিম-ভাঁড়ারিদেরও লাভের ব্যবস্থা করে রেখেছেন তারা। এই তো গত ষোলই ফেব্রুয়ারির *সংবাদ*-এর খবরে রয়েছে: 'সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শরীয়তপুরের পদ্মা নদীর সুরেশ্বর থেকে মেঘনার জালালপুর পর্যন্ত প্রায় ২৫ কিলোমিটার এলাকাব্যাপী অবাধে চলছে জাটকা নিধনের মহা উৎসব'। প্রচুর আসছেও হাটে-বাজারে, ফেরিওয়ালাদের মাথায় মাথায়। কেন হচ্ছে এমন! এটা কি নববর্ষে ইলিশ খাওয়ানোর অত্যুগ্র আয়োজনের প্রভাবে নয়? চাহিদা-সরবরাহ, অর্থনীতির এই স্বাভাবিক নিয়ম এখানে কাজ করছে বটে কিন্তু 'চাহিদা'টিকে এখানে কি অস্বাভাবিকভাবে তৈরি করা হচ্ছে না নিয়ম আর আইনকে অমান্য করে? এতে কি তারা অপরাধী সাব্যস্ত হচ্ছেন না? হচ্ছেন বটে। তা পয়লা বৈশাখে আপ্যায়ন করে খাওয়াতেই যদি হয় তো ফল দিয়ে করা যেতে পারে। বৈশাখ তো গ্রীষ্মকালের মাস, আর এই কালটি তো নানা রকম রসালো ফলের কাল। চিঁড়ে-দই আর ফল দিয়ে ফলার আয়োজন করা যেতে পারে অথবা বৈশাখি করা যায়; অর্থাৎ আমাদের গ্রামবাংলায় যে প্রচলিত আছে বৈশাখে মায়েদের কাঁঠাল ভাঙতে হয় সেই প্রথাকে বাঁচিয়ে তোলা যায় নতুন করে। জাতীয় ফল কাঁঠাল দিয়েও তো পান্তা খাওয়া হয়, নয় কি? কিন্তু ইলিশ! নৈব নৈব চ।

কী করে হবে এ অবস্থার পরিবর্তন! সামাজিক সচেতনতাই মনে হয় এর একমাত্র সমাধান। তারও আগে বুঝতে হবে প্রকৃতিতে সৃষ্ট প্রতিটি বস্তুই আমাদের জন্য প্রয়োজনীয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা আমাদেরই সাবলীল অস্তিত্ব চলমান রাখার স্বার্থে একান্ত জরুরি। এটা সম্ভব যদি প্রকৃতিকে তার আপন গতিতে চলতে দিই, তস্করের মতো তার সম্পদকে লুটেপুটে নিয়ে লণ্ডভণ্ড করে না দিই তাহলেই। ইলিশ মাছ আমাদের প্রিয় একটি মাছ, আমরা অবশ্যই সেটা খাব, প্রাণের সাধ মিটিয়ে খাব; কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যাতে সাধ মিটিয়ে খেতে পারে সে বিষয়টিও তো দেখতে হবে। আমরা যদি ইলিশের বংশ বিস্তারকে বাধাগ্রস্ত করি তাহলে কি সেটা আর সম্ভব হবে তেমনভাবে! এখনই তো তার নমুনা দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া ইলিশগুলো মিঠাপানিতে যথেষ্ট দিন থাকতে পারছে না বলে স্বাদে আর ঘ্রাণেও পার্থক্য হয়ে গেছে প্রচুর।

সুতরাং পয়লা বৈশাখকে উপলক্ষ করে ইলিশ খাওয়ার যে অশুভ প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে, সমবেতভাবে তা ঠেকিয়ে দেবার সময় এসেছে। ইলিশের আর মানুষের মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে, অনেক গবেষণা আর পর্যবেক্ষণ করে মৎস্য বিজ্ঞানীরা যে সুপারিশ করেছেন এবং তার উপর ভিত্তি করে আমাদের মৎস্য অধিদপ্তর যে আইন করেছে তা মেনে চলা দরকার। শপথ নিই পয়লা নভেম্বর থেকে ত্রিশ জুন পর্যন্ত ইলিশ মাছ খাব না। সংগত কারণ থাকলে যে আমরা এক হয়ে অনেক কিছুই করে ফেলতে পারি তার উদাহরণের তো অভাব নেই আমাদের!

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, সরকারি জাহেদা সফির মহিলা কলেজ, জামালপুর

বিশেষ নিবন্ধ

ঢাকার বাগ-বাগিচা-বাগান

বরুণ দাস

সময়ের সাথে সাথে কত কিছুইতো বদলে যায়, তাই না? এই যেমন প্রবহমান কালের স্রোতে কতখানি যে বদলে গেছে আমাদের বসবাসকারী এই রাজধানী শহর ঢাকা; তা কি আমরা সহজেই বুঝে উঠতে পারি? হয়ত পারি না। কারণ ১৬০৮; মতান্তরে ১৬১০ সালে আজকের এই মহানগরী ঢাকা সেই সময়কার পূর্ব ভারতের প্রবল শক্তিশালী মোগল সাম্রাজ্যের সুবা বাংলা তথা তদানীন্তন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সম্মিলিত প্রদেশের রাজধানী নির্বাচিত হয়।

বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে গড়ে ওঠা ঢাকা শহরটির প্রাচীন ইতিহাস কিন্তু বেশ খানিকটা রহস্যাবৃত। ঢাকা চারশ বছর অতিক্রম করে ইতিহাসের নানা পালা বদলের সাক্ষী হয়ে থাকলেও এর প্রাচীন ইতিহাস কিন্তু খুব একটা জানা যায় না। মোগল আমলে ১৬১০ সালে ঢাকা যখন বাংলার রাজধানী হলো, তখন এ শহরের সরকারি নাম দেওয়া হয়েছিল 'জাহাঙ্গীরনগর'। অবশ্য নামটি কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল।

মাঝে ১৭০৪-১৭০৫ সালে মুর্শিদাবাদে রাজস্ব দফতর স্থানান্তরিত হলে ভাটা পড়ে ঢাকার বৈভবে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটিশ আমলে আবার পুনরুজ্জীবন পায় ঢাকা। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে ঢাকা আবার পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদা পায়। ১৯১১ সালে তা আবার পরিবর্তন হয়। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে ভারত, পাকিস্তান– এ দুটি রাষ্ট্রে উপমহাদেশ বিভক্ত হলে ঢাকা হয় পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। তারপর ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর ঢাকাকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

মজার বিষয় হলো, পৃথিবীতে ঢাকাই সম্ভবত একমাত্র শহর যে শহর চার চারবার রাজধানী হবার গৌরব অর্জন করেছে। সেই মোগল আমল থেকে এ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের যাবতীয় সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল এই ঢাকা শহর। সেই ঢাকা এখন মহানগর, মেগাসিটি; যার ভূ-স্থানিক সম্প্রসারণ একটি অব্যাহত ধারা। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এখানে বাস করে প্রায় দেড় কোটি মানুষ। অতীতের একটি ছোট্ট জনপদ থেকে আজকের এই মেগাসিটি ঢাকার অনেক রূপান্তর আর বিবর্তন ঘটেছে, ঘটে চলেছে। বর্তমানে আমাদের চেনাজানা ব্যস্ত এলাকা শাহবাগে একসময় চমৎকার বাগান ছিল; বর্তমানের হাতিরপুলে কিন্তু সত্যি সত্যিই হাতিদের চলার জন্য একটি পুল ছিল যার অস্তিত্ব এখন আর নেই। একসময় ঢাকার চারপাশ দিয়ে প্রায় ২৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ খাল ছিল, বর্তমানে যার দেখা মেলাও ভার। এসব ভরাট হয়ে দিন দিন কেবল এর আয়তন বেড়ে চলেছে।

ঢাকা আমাদের ঐতিহ্য আর গৌরবের একটি শহর। ঢাকার বর্তমানের ইতিহাস বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথেই সম্পৃক্ত। এককথায় বলা চলে– বর্তমান বাংলাদেশ ঢাকার-ই সৃষ্টি। কেননা এখান থেকেই যুগান্তকারী ঘটনার উৎপত্তি এবং সম্প্রসারণ ঘটেছে যুগে যুগে। যে-কোনো মহানগরীর মতো ঢাকারও অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে আছে রোমাঞ্চকর ইতিহাস।

প্রাচীন একটি মানচিত্র থেকে দেখা যায় যে, শহর-ঢাকার তিন ভাগের দুই ভাগই ছিল বাগ-বাগিচায় অর্থাৎ বাগানে ঢাকা। এই মানচিত্রের চিত্রকর ছিলেন ভারতের প্রথম সার্ভেয়র জেনারেল জেমস রেনেলে। এখন শুনতে অবাক লাগলেও এটি সত্যি যে, শহর ঢাকায় যত্রতত্র গড়ে উঠেছিল বহু বাগ-বাগিচা। এর অন্যতম দৃষ্টান্ত পিলখানার পেছন দিকে নবাব রশিদ খাঁ-কা বাগিচা, রমনার বাগ-ই শাহী; যা বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও শাহবাগ। কার্জন হল চত্বরের বাগ-ই মুসা, হোসেনি দালান, বকশি বাজার এলাকার বাগ-ই উমেদ বুজুর্গ, দিলকুশার নবাবি বাগিচা এবং পোস্তগোলার হুক্কাবাহকের বাগান। এছাড়া লালবাগ, স্বামীবাগ, পরীবাগ, শান্তিবাগ, মধুবাগ, গোলাপবাগ প্রভৃতি এলাকায়ও যে বাগ-বাগিচা ছিল তা নাম থেকেই বোঝা যায়।

আরামবাগ

মোগল সংস্কৃতির ধারায় 'বাগ' বা 'বাগান' গড়ে তোলা একসময় ঢাকা শহরের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছিল। এরকমই একটি বাগানসমৃদ্ধ এলাকা ছিল 'আরামবাগ'। বাগ বা বাগানে প্রচুর গাছ থাকায় রৌদ্র-তাপে শ্রান্ত মানুষ এর নিচে আশ্রয় পেয়ে এবং ফল খেয়ে বেশ আরাম পেত। এ থেকেই এর নাম আরামবাগ এসেছে। আরামবাগ বর্তমানের অতি ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকা হলেও এর বাগ নামটি মুছে যায়নি। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৩২ নম্বর ওয়ার্ড হিসেবে এর পরিচিতি হলেও আরো একটি পরিচয় অনেকেরই জানা আছে। সেটা হলো প্রায় আটশত প্রেস বা ছাপাখানা রয়েছে এই এলাকায়। প্রেসপাড়া হিসেবেও এটি বহুল পরিচিত এলাকা। ঢাকার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নটর ডেম কলেজ আরামবাগেই অবস্থিত।

চামেলিবাগ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত এলাকা চামেলিবাগ। এর উত্তরে মালিবাগ ও রাজারবাগ, দক্ষিণে শান্তিনগর। ছোটো আয়তনের এই এলাকাটিতে একসময় চামেলি ফুল গাছের

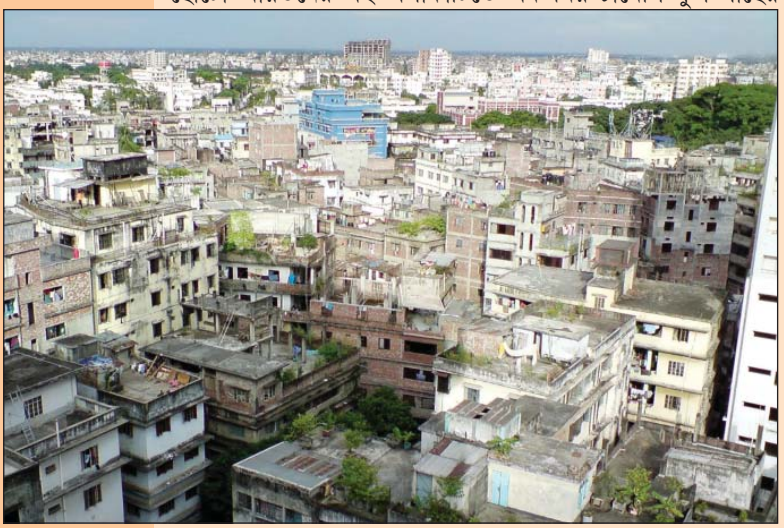

আরামবাগ

বিপুল সমারোহ ছিল বলে জানা যায়। সেই থেকেই জায়গাটির নামকরণ করা হয়েছে 'চামেলিবাগ'। বর্তমানে এটি একটি পরিচ্ছন্ন আবাসিক এলাকা হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিতি পেলেও এখানে বেশ কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানও রয়েছে।

মোমেনবাগ

রাজারবাগ এলাকার উত্তর দিকের একটি এলাকার নাম মোমেনবাগ। আউটার সার্কুলার রোডের অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল মোমেন এখানে একটি বড়োসড়ো বাগান তৈরি করেছিলেন। ফলে স্থানটি পরিচিতি পায় 'মোমেনবাগ' নামে। ঢাকার এই জায়গাটিতে বিশ শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশক থেকে জনবসতি গড়ে উঠেছে।

মধুবাগ

ঢাকা শহরের মগবাজার-নয়াটোলার কাছে অবস্থিত একটি এলাকার নাম 'মধুবাগ'। এক সময় এলাকাটি ঘন বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এই জঙ্গলে মৌমাছিরা মধুর চাক উৎপন্ন করে মধু উৎপন্ন করত। তাই এলাকাটি 'মধুবাগ' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

মালিবাগ

বর্তমানে 'মালিবাগ' এলাকাটি বেশ ব্যস্ত একটি এলাকা এবং ঢাকার পুরোনো ও ঐতিহ্যবাহী জায়গাগুলোর মধ্যে অন্যতম। ঢাকার বিভিন্ন বাগানে কর্মরত বাগানমালিরাই কেবল মালিবাগে বাস করতেন। একসময় মালিবাগের আশপাশে ছিল নবাব রশিদ খাঁ-র বাগিচা, বাগে হোসেন উদ্দিন ও নবাব বাগিচা। এসব বাগিচায় মালিবাগের মুসলিম মালিরা ফুল পরিচর্যার কাজ করতেন এবং ঢাকার চকবাজারসহ বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এরা ফুলের তোড়া, গয়না, মালা ইত্যাদি সরবরাহ করতেন। তারাই পরিবার পরিজন নিয়ে বাস করতেন বর্তমানের মালিবাগে।

গোপীবাগ

রাজধানীর দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত কয়েকটি লেনে বিভক্ত গোপীবাগ এলাকাটি এখন বেশ ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হিসেবেই পরিচিত। এর পূর্ব দিকে গোলাপবাগ, পশ্চিমে টিকাটুলি, দক্ষিণে স্বামীবাগ এবং উত্তরে কমলাপুর এলাকা। এখানে বাগ-বাগিচার উল্লেখ পাওয়া না গেলেও জানা যায় গোপীনাথ সাহা নামে একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। এলাকাটি তার সম্পত্তির অংশ ছিল। এই অঞ্চলে তিনি গোপীনাথ জিউর মন্দির স্থাপন করেছিলেন। তার নামানুসারে এই এলাকার নাম হয় গোপীবাগ। এখানে ভারতের বেলুড়ে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা ১৮৯৯ সালে স্থাপিত হয়।

গোলাপবাগ

গোপীবাগের পাশের এলাকাটিই গোলাপবাগ নামে পরিচিত। ঢাকার এক সময়কার বিখ্যাত রোজগার্ডেনকে কেন্দ্র করেই গোলাপবাগ নামটির উৎপত্তি। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির এক সময়ের চেয়ারম্যান কাজী বশিরের সুদৃশ্য বাড়িখানা ছিল রোজগার্ডেন বা গোলাপবাগ নামে পরিচিত। এই বাড়ির পেছনের দিকে একসময় জনবসতি গড়ে উঠলেও এলাকাটি গোলাপবাগ নামেই পরিচিতি লাভ করে। বাড়িটিতে একসময় প্রচুর গোলাপ গাছ থাকলেও এখন আর সেই অবস্থা নেই। তবে গোলাপের রেশ ধরে সেই নামটি আজও রয়ে গেছে। সম্প্রতি সরকার বাড়িটি পুরাকীর্তির আওতায় আনার আদেশ দিয়েছে।

সোবহানবাগ

বর্তমানে ধানমন্ডি থানার ৫১ নম্বর ওয়ার্ডভুক্ত সোবহানবাগ এলাকাটি ব্রিটিশ যুগে ছিল ধানক্ষেতে পরিপূর্ণ। পুরোনো ঢাকার ইসলামিয়া লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রাক্তন ডেপুটি প্রশাসক জাহাঙ্গির মোহাম্মদ আদিল-এর পিতামহ মাওলানা আবদুস সোবহান এলাকাটি কিনে একটি বাগান প্রতিষ্ঠা করেন। তার নামানুসারেই এই এলাকাটির নামকরণ করা হয় সোবহানবাগ। বর্তমানের সোবহানবাগ মসজিদটি একটু ছোটো আকারে সোবহান সাহেব নিজের খরচেই নির্মাণ করেছিলেন। কিছুকাল আগে মসজিদটি সংস্কার করা হয়। এর পাশে তিনি একটি পুকুরও খনন করিয়েছিলেন। বর্তমানে তার অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ১৯৪০ সালে মাওলানা আবদুস সোবহান পরলোক গমন করেন; কিন্তু নামটি তার নামেই রয়ে গেছে আজও।

কলাবাগান

ঢাকা শহরের বর্তমানের রাসেল স্কোয়ারের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত কলাবাগান। এর উত্তরে পান্থপথ, পশ্চিমে মিরপুর রোড, পূর্বদিকে গ্রিন রোড অবস্থিত। আনুমানিক ৩ বর্গকিলোমিটার আয়তনের কলাবাগান এলাকা হিসেবে কিন্তু খুব বেশি পুরোনো নয়। ঢাকার আদি বাসিন্দাদের অনেক জমি ছিল এই এলাকায়। আলাউদ্দিন সরদার নামে এক লোকেরই জমি ছিল প্রায় ছয়শ বিঘার মতো। ঐ সময় এলাকাটি ছিল জঙ্গল আর বনে পরিপূর্ণ। বর্তমান কলাবাগান বাসস্ট্যান্ড থেকে কলাবাগান মসজিদ পর্যন্ত জায়গাটুকু এককালে জনৈক ডা. হর্ষ নাথের ছিল। এখানে তিনি প্রচুর কলাগাছ লাগিয়েছিলেন। সেই থেকে লোকমুখে কলাবাগান নামটি প্রচলিত হয়ে গেছে বলে ধারণা করা হয়। একইভাবে কাঁঠালের বাগান থেকে কাঁঠালবাগান জায়গাটির নামকরণ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। বর্তমানের কলাবাগান বেশ খানিকটা সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবেই পরিচিত।

সেগুনবাগিচা

ঢাকার যে জায়গাটি আজ সেগুনবাগিচা নামে পরিচিত, একসময় সেখানে ছিল প্রচুর সেগুন গাছ। অবশ্য পরবর্তীকালে সেগুন বাগান সাফ করে স্থানটিকে আবাসিক এলাকায় পরিণত করা হয়। সেগুন বাগান সাফ হলেও এলাকাটির নাম পরিবর্তন করা হয়নি, সেগুনবাগিচাই রয়ে গেছে। বর্তমানে এলাকাটিকে রাজধানীর শিল্প-সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।

শহীদবাগ

আউটার সার্কুলার রোডে রাজারবাগের কাছে আইয়ুব আমলের বিডি মেম্বার জনাব শহীদ 'শহীদ মেম্বার' নামেই এলাকাবাসীর কাছে পরিচিত ছিলেন। এই এলাকায় তার বেশ কিছু জায়গাজমি ছিল। সেই জায়গাগুলো একসময় বিক্রি হয়ে যায় এবং এলাকাটি শহীদবাগ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

মির্জাবাগ

যেসব এলাকায় গোয়ালাদের বাস ছিল সেই এলাকাকে বলা হতো গোয়ালপাড়া বা গোয়ালটুলি। ১৯২৮ সালে এরকমই একটি অঞ্চল গোয়ালপাড়া তৎকালীন ঢাকা পৌরসভার কমিশনার নরেন্দ্র নাথ বসাকের নামানুসারে নরেন্দ্র নাথ বসাক রোড নামে পরিচিতি পায়। এর আগে ১৮৮৪ সালে ঢাকার পৌর কমিশনার ছিলেন গোপী মোহন বসাক। তখন এলাকাটির নাম ছিল গোপী মোহন বসাক লেন। কিন্তু তারও আগে জনৈক মির্জা সাহেব এই এলাকায় অনেক বাগান করেছিলেন। সেই নামানুসারে এলাকাটির নাম ছিল মির্জাবাগ।

নবাববাগিচা

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৫৯ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত একটি প্রাচীন এলাকার নাম নবাবগঞ্জ। অথচ মাত্র কয়েকযুগ আগেও এটি

'নবাববাগিচা' নামে সুপরিচিত ছিল। মোগল আমলে এ অঞ্চলটিতে নবাব পরিবার, আমির-ওমরা, পদস্থ রাজ কর্মচারী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বসবাস ছিল। সে সময়ে নবাব রশিদ খাঁ একটি বাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে ঐ এলাকাটি রশিদ খাঁ-কা বাগিচা নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। মোগল পরবর্তী সময়ে এলাকাবাসী রশিদ শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু নবাববাগিচা নামেই আখ্যায়িত করত।

নবাবি আমলেই এ এলাকায় সদর রাস্তার ধার থেকে নদীতীর পর্যন্ত একটি অংশে বাজার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় বাজারটি নবাবগঞ্জ নামে পরিচিতি লাভ করে। নবাবি আমলের পর নবাবের বাগ-বাগিচার অস্তিত্ব মুছে গেলে সে জায়গায় মুসলিম জনবসতি গড়ে ওঠে। এদিকে হোসেনী দালানের কাছেও একটি ছোট্ট অংশকে মোগল যুগের নবাবদের নামানুসারে নবাববাগিচা তথা নবাব গার্ডেন নামে অবহিত করা হয়ে থাকে।

হাজারিবাগ

পুরোনো ঢাকার হাজারিবাগ এলাকাটি আমাদের সবার কাছেই চামড়া শিল্পের জন্য পরিচিত। তবে মোগল আমলে এখানে বেশ বড়ো আকারেই একটি বাগ বা বাগিচা ছিল। বাগানটি সম্ভবত হাজারি পদবিধারী কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্যোগে গড়ে ওঠে। এজন্য এলাকাটিকে হাজারিবাগ নামে অভিহিত করা হয়। হাজারিবাগের পাশেই একসময় জনৈক কাজি সাহেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি সদৃশ্য বাগিচা। সে এলাকাটি এখন কাজিরবাগ নামেই পরিচিত। উনিশ শতকের শেষের দিকে হাজারিবাগ এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে চামড়া ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা শুরু করেন।

শাহবাগ

রাজধানীর অন্যতম যোগাযোগ কেন্দ্র এবং ঢাকার একটি অন্যতম ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচিত 'শাহবাগ'। তবে নবাবি আমলে এই জায়গাটিকেই বলা হতো 'ঢাকার বেহেশতখানা'। প্রায় সাড়ে চার বর্গকিলোমিটার এই এলাকায় বসবাসকারী লোকসংখ্যা প্রায় দেড় লাখ। আয়তাকার আকৃতির ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে পরিচিত শাহবাগ মূলত পুরনো ঢাকা এবং নতুন ঢাকার মধ্যকার সীমানায় অবস্থিত; যার পত্তন হয়েছিল ১৭শ' শতকে মোগল শাসনামলে। এর আদি নাম ছিল 'বাগ-ই-বাদশাহী'–যার অর্থ হচ্ছে 'রাজার বাগান'।

শাহবাগ ছিল মূলত ঢাকার নওয়াবদের বাগানবাড়ি। বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র টিএসসি, কলাভবন ও জাতীয় জাদুঘর এলাকা নিয়ে বিস্তৃত ছিল এই বাগানবাড়ি। মোগল আমলে বর্তমানের হাইকোর্ট ও শিশু একাডেমি এলাকায় ছিল বাগ-ই-বাদশাহী। এর পাশে বর্তমানের বাংলা একাডেমি ও টিএসসি এলাকায় ছিল সুজাতপুর আবাসিক অঞ্চল। বাগ-ই-বাদশাহী ও সুজাতপুরের মধ্যে ছিল বিস্তীর্ণ একটি খোলা মাঠ যা রমনা নামে আজও সুপরিচিত।

মোগল আমলের শেষ দিকে রমনার ক্ষয়পর্ব শুরু হয়েছিল। অযত্ন-অবহেলায় এর অনেক অংশ পরিণত হয়েছিল ঘন জঙ্গলে। ইংরেজ আমলে সেই রমনার হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস ড'স। সর্বশক্তি দিয়ে তিনি ঢাকা শহরকে ঝকঝকে করার বাসনায় মেতে উঠেছিলেন। মজার ব্যাপার হলো, ঐ পরিচ্ছন্ন অভিযানে তিনি নিয়োগ করেছিলেন জেলের কয়েকশ কয়েদিকে।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে সুজাতপুর এলাকায় আর্মেনীয় ভূস্বামী আরাতুন এবং ব্রিটিশ বিচারক গ্রিফিথ কুক দুটি বাগানবাড়ি তৈরি করেছিলেন। এ দুটির অবস্থান ছিল বর্তমানের বাংলা একাডেমির পাশে অবস্থিত সাবেক আণবিক শক্তি কমিশনের অফিসের সাথে। অবসর গ্রহণ করার পর ১৮৪৪-৪৫ সালের দিকে নিজেদের এই সম্পত্তি তারা বিক্রি করে দিয়েছিলেন নবাব খাজা আব্দুল গণির পিতা খাজা আলীমুল্লাহর কাছে। নবাব আব্দুল গণি অবসর কাটাতে ১৮৭৩ সালে একটি বাগানবাড়ির নির্মাণ কাজ শুরু করেন। মোগলদের বাগ-ই-বাদশাহীর অনুকরণে নবাব এর নাম রাখেন 'শাহবাগ'। এর উত্তর পাশেই নবাব খাজা সলিমুল্লাহর আমলে গড়ে উঠেছিল 'পরীবাগ' বাগানবাড়ি।

সেই আমলে ঢাকা শহরের অনেকাংশের মালিক ছিলেন নবাব আব্দুল গনি। শাহবাগ, বেগুনবাড়িতে ছিল তার বাগান, অট্টালিকা। এখন শুনতে হয়তো অবাক লাগতে পারে, তবুও সত্যি হলো বেগুনবাড়িতে ত্রিশ বিঘা জমি পরিষ্কার করে তিনি তৈরি করেছিলেন চা বাগান। রমনা রেসকোর্স হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল যে জায়গাটি সেটিও ছিল তার সম্পত্তির অন্তর্গত। ঢাকায় পেশাদারি ঘোড়দৌড়ের প্রচলন করেছিলেন এই নবাব। ঢাকার প্রথম সংবাদপত্র *ঢাকা নিউজ*-এর তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় উদ্যোক্তা।

শাহবাগে কয়েক একর জমির উপর গড়ে ওঠা 'ইশরাত মঞ্জিল' নামের দ্বিতল ভবনটি ছিল সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। এটি মূলত বাইজিদের নাচার জন্য নাচঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে ১৯০৬ সালে এ দালানটি নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনের স্থান হিসেবে পরিণত হয়, যাতে প্রায় চার হাজার অংশগ্রহণকারী যোগ দিয়েছিলেন। 'ইশরাত মঞ্জিল' পুনঃনির্মাণ করে তৈরি হয় হোটেল শাহবাগ, যা ছিল ঢাকার প্রথম আন্তর্জাতিক হোটেল। ১৯৬৫ সালে ভবনটি ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ সংক্ষেপে বর্তমানের পিজি হাসপাতাল অধিগ্রহণ করে, যা পরবর্তীকালে ১৯৯৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা অধিগৃহীত হয়।

শাহবাগ

অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন এলাকায় 'মধুর ক্যান্টিন' নামে পরিচিত যে ভবনটি রয়েছে সেটি ছিল মূলত বাগানবাড়ির 'জলসাঘর'। ভবনটির মেঝে ও চারদিকের প্রশস্ত অঙ্গন ছিল মার্বেল পাথরে বাঁধানো। এখানে নবাব পরিবারের লোকেরা স্কেটিং অনুশীলন করতেন বলে

ভবনটিকে 'স্কেটিং প্যাভিলিয়ন'ও বলা হতো। এই ভবনটির দুটি গোলাকার কক্ষ আজও টিকে আছে। পরবর্তীতে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকদের খাওয়া এবং আড্ডার স্থান হিসেবে পরিণত হয়। ১৯৬০ সালের শেষ দিকে মধুর ক্যান্টিন পরিণত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত ছাত্রদের একটি মিলনস্থল হিসেবে, যার একদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ এবং অন্যদিকে আইবিএ রয়েছে। মধুর ক্যান্টিন এখনো শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতীক হয়ে রয়েছে।

'নিশাত মঞ্জিল' নামে আরো যে একটি দ্বিতল ভবন ছিল সেটি ছিল নবাবদের পারিবারিক জাদুঘর। বর্তমানের কাঁটাবন জায়গাটি ছিল নবাবদের ঘোড়ার আস্তাবল। শাহবাগে একটি চিড়িয়াখানাও ছিল। এখন যে জায়গাটিতে কাঁটাবন মসজিদ অবস্থিত তার দক্ষিণ পাশে বৃত্তাকারে নির্মিত একটি আস্তাবলও ছিল যা বেশ আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই আস্তাবলটিও বাগানবাড়ির অংশ ছিল। এই শাহবাগেই নবাবেরা একটি চিড়িয়াখানাও স্থাপন করেছিলেন।

পরীবাগ

শাহবাগ এলাকায় নবাবদের সবচেয়ে পুরাতন ভবন ছিল সুজাতপুর প্যালেস, যা 'বর্ধমান হাউজ' নামে পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব-বাংলার গভর্নরের বাসভবনে রূপান্তর করা হয়। আরো পরে এটি বাংলাদেশে, বাংলা ভাষা বিষয়ক সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বাংলা একাডেমিতে পরিবর্তিত হয়। প্যালেসের বেশ কিছু এলাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলন কেন্দ্রের জন্য হস্তান্তর করা হয়।

১৯১৫ সালে নবাব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর তার পুত্র নবাব খাজা হাবিবুল্লাহর নানা অব্যবস্থার জন্য ঢাকার নবাবদের জমিদারির মতো শাহবাগেরও জৌলুশ কমতে থাকে। এর মাঝে পারিবারিক কোন্দলের কারণে সেটি ধীরে ধীরে অংশীদারদের মধ্যে ভাগাভাগি শুরু হলে শাহবাগ তার চাকচিক্যময় ঐতিহ্য হারাতে শুরু করে।

পরীবাগ

শাহবাগের উত্তর পাশেই ঢাকার নবাবদের আর একটি বাগানবাড়ি ছিল যার নাম 'পরীবাগ'। এর নির্মাণকাল ১৯০২ সাল। কালের বিবর্তনে নবাবি আমলের দীর্ঘসময় পেরিয়ে গেলেও শাহবাগের উত্তরে অবস্থিত ঢাকার 'পরীবাগ' আজও ঐ একই নামে পরিচিত। শাহবাগ এবং পরীবাগের মধ্যবর্তী সীমানায় একসময় একটি দেয়াল দিয়ে চিহ্নিত ছিল; বর্তমানে সে দেয়াল আর নেই। পরীবাগ এখন অভিজাত এলাকা হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেছে।

অনেকের মতে নবাব খাজা সলিমুল্লাহ তাঁর প্রিয় স্ত্রী পেয়ারী বেগমের নামে এর নামকরণ করেছিলেন পরীবাগ। আবার কারো কারো মতে, নবাব আহসানউল্লাহর কন্যা অর্থাৎ সলিমুল্লাহর বোন পরীবানুর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে পরীবাগ।

পরীবাগ এলাকাটি ছিল খানাখন্দে ভরা পতিত অবস্থায়। নবাব এখানে কয়েকটি পুকুর খনন করেন এবং খানাখন্দ ভরাট করে বাগ-বাগিচায় পরিণত করেন। ১৯০৫ সালে নবাব সলিমুল্লাহ পরীবাগের পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষে একটি জামে মসজিদ তৈরি করেছিলেন। অনেকবার এতে সংস্কারের ফলে মসজিদটির আদি যে রূপ ছিল সেটি বদলে গেছে। পরীবাগে নবাব সলিমুল্লাহর একটি গাভীর খামারও ছিল। খামারটির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সৈয়দ আব্দুর রহিম নামে একজন সাধক পুরুষ। আধ্যাত্মিক অনুশীলনের কারণে তিনি পরীবাগে শাহ সাহেব নামেও পরিচিত ছিলেন। প্রায় দেড়শ বছর জীবিত থাকার পর ১৯৬১ সালে তিনি ইন্তেকাল করলে তাঁর আসনের জায়গাতেই তাকে দাফন করা হয়। তাঁর মাজারটি এখনো ভক্তদের আনাগোনায় মুখরিত থাকে।

পাকিস্তান আমলে আহসান মঞ্জিলের চেয়ে পরীবাগেই ঢাকার নবাব পরিবারের অধিকসংখ্যক খ্যাতিমান ব্যক্তিরা বাস করতেন। ঢাকার নবাবদের বংশধরদের মধ্যে এখনো কেউ কেউ এই পরীবাগেই বসবাস করছেন।

লালবাগ

লালবাগ এলাকাটির পত্তন ঠিক কখন, কবে, কীভাবে হয়েছিল তার সঠিক দিন-ক্ষণ খুঁজে পাওয়া না গেলেও মোগল আমলে, সম্ভবত ঢাকা রাজধানী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর পত্তন ঘটেছিল। এর বিস্তীর্ণ জায়গাজুড়ে ছিল লাল ফুলের বাগান।

১৬৬৮ সালে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র মুহাম্মদ আযম শাহ বাংলার সুবাদার হিসেবে ঢাকা এসে পৌঁছান। ঢাকায় তার অবস্থান ছিল মাত্র এক বছর। যুবরাজ আযম ঢাকায় এসে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে একটি দুর্গ নির্মাণ শুরু করেন। পিতার নামের সাথে মিল রেখে নাম দেন 'কিলা আওরঙ্গাবাদ'। ঐ সময়ের কিছু কাগজপত্রে কিছুদিনের জন্য এই নামের উল্লেখ পাওয়া গেলেও সবাই একে লালবাগ দুর্গ নামেই জানত।

যুবরাজ আযম দুর্গটির নির্মাণ শুরু করলেও সম্রাটের আদেশে অচিরেই তাকে ঢাকা ত্যাগ করতে হয়েছিল। তার পরিবর্তে ১৬৭৯ সালে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলার সুবাদার হিসেবে রাজধানী ঢাকায় এলেন শায়েস্তা খান। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই দুর্গের মালিক হওয়া সত্ত্বেও এর প্রতি কোনো আকর্ষণবোধ করেননি। ফলে তিনি এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না করলেও নির্মাণ করেছিলেন অকালে প্রাণ হারানো কন্যা বিবি পরীর কবরের ওপর অপূর্ব এক স্মৃতিসৌধ। লালবাগ যখন নির্মিত হয়েছিল তখন এর পাশ দিয়ে নিরবধি বয়ে যেত বুড়িগঙ্গা নদী। কয়েকটি প্রবেশদ্বার ছাড়াও দুর্গের চৌহদ্দির মধ্যে ছিল শায়েস্তা খানের কন্যার কবর, একটি মসজিদ ও হাম্মামখানা।

বিশ্বের অন্যান্য অনেক শহরের বেলায় একটি প্রতীকী নিদর্শন থাকে; যেমন- আইফেল টাওয়ার-এর কথা বললে প্যারিসের কথা মনে পড়ে। বিগবেন বললে চোখে ভেসে ওঠে লন্ডন শহরের কথা। ঠিক সেরকম ঢাকা শহরের কথা বললে অথবা কথা উঠলে এখনো লালবাগ-এর কথাই মনে পড়ে। মোগল আমল থেকে এখনো পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেসব পর্যটক ঢাকায় এসেছেন, তারা একবারের জন্য হলেও দেখতে গেছেন লালবাগ। লালবাগ এলাকাটি বিশেষভাবে পরিচিত লালবাগের দুর্গের কারণে।

লেখক : গণমাধ্যমকর্মী

নিবন্ধ

২রা এপ্রিল : বিশ্ব অটিজম দিবস

বাংলাদেশে অটিজম সমস্যা

পারভীন আক্তার লাভলী

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা কিংবা অটিজম এর শিকার। প্রতিবছর আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে অটিজম আক্রান্তের সংখ্যা। ১৯৯৭ সালের ৩রা ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত দ্বিতীয় দক্ষিণ এশিয়া সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে তহবিল গঠনের পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' গঠিত হয়।

অটিস্টিক ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের মাঝে বিশেষ কোনো সচেতনতা বা স্পষ্ট ধারণা ছিল না। প্রথমেই প্রশ্ন জাগে অটিজম কী? অটিজম এক ধরনের শিশু মনোব্যাধি। যে কারণে শিশু নিজেকে গুটিয়ে রাখে।

অটিস্টিক শিশুদের চেনা, বোঝা ও উপলব্ধি করার উপায়

১. অটিস্টিক শিশুদের দৈহিক বিকাশের হার স্বাভাবিক শিশুদের চেয়ে কম থাকে।
২. ওজন, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি সমস্ত দিক থেকে ওরা সমবয়সি শিশুদের থেকে পিছিয়ে থাকে।
৩. শিশুর হাঁটা, বসা, কথা বলা প্রভৃতি শারীরিক বিকাশগুলো বয়সের তুলনায় পিছিয়ে যায়।
৪. এদের দ্বারা কোনো সূক্ষ্ম কাজ করা সম্ভব নয়।
৫. অনেকের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের ভাষা উচ্চারণে ত্রুটি লক্ষ করা যায়।
৬. শিক্ষাগত অনগ্রসরতা এদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।
৭. বয়স অনুপাতে এদের আবেগিক বিকাশও কম হয়।
৮. এদের বয়স অনুযায়ী সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে না।
৯. এই শিশুরা যে বয়সে যে আচরণ করার কথা, সে বয়সে সেই রকম আচরণ করতে পারে না।
১০. এসব শিশুদের মলমূত্র ত্যাগের প্রশিক্ষণ দিতে সমস্যা হয়।
১১. তাদের দৃষ্টি, শ্রবণ এবং স্নায়বিক সমস্যা অনেক বেশি থাকে।
১২. স্বল্পমেয়াদি স্মৃতির ত্রুটির জন্য অটিস্টিক শিশুরা পুনরাবৃত্তি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা এপ্রিল ২০১৭ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অটিজম অতিক্রমে সফল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেন –পিআইডি

১লা এপ্রিল ২০১৬ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে 'অটিজম মোকাবেলা : এসডিজির আলোকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কৌশল' শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের সভায় প্যানেলিস্ট হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের অটিজম বিশেষজ্ঞ সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এবং প্রাক্তন জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন-এর স্ত্রী ইয়ূ সুন তায়েক

করতে পারে না।

১৩. অসহায়বোধ ও অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।
১৪. এদের মানসিক বয়স ৪-৯ বছর বয়সের শিশুর সমতুল্য।
১৫. এরা সব সময় অস্থির থাকে।
১৬. চিৎকার করে এবং অর্থহীন শব্দের উচ্চারণ করে।
১৭. এরা আত্মরক্ষার কাজকর্ম সম্পাদন করতে পারে না।
১৮. এই শিশুদের স্বাভাবিক শারীরিক বিকাশ হলেও, মানসিক বিকাশে তারা পিছিয়ে থাকে।
১৯. এদের শিখে মনে রাখার ক্ষমতা কম থাকে।
২০. এরা অন্যের ভাষা বুঝতে পারে না।
২১. নিজে গুছিয়ে বলতে পারে না।
২২. এরা ঠিকমতো পড়তে পারে না।
২৩. গোসল করতে পারে না, দাঁত মাজতে পারে না, শরীরের যত্ন নিতে পারে না।
২৪. এরা পায়ের আঙুলের উপর ভর করে হাঁটে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে সরকার গৃহীত কর্মকাণ্ড

২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-২০১৫ সময়কালে মোট ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এসব কেন্দ্রে ফিজিওথেরাপি, ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপি, ক্লিনিক্যাল অকুপেশনার থেরাপি, ক্লিনিক্যাল স্পিচ অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি-এর মাধ্যমে অটিজমের শিকার শিশু/ব্যক্তি এবং অন্যান্য ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে নিয়মিত থেরাপি সেবা, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ সেবা এবং বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ হিসেবে কৃত্রিম অঙ্গ, হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, ক্র্যাচ, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্র্যাচ ইত্যাদি এবং আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিন প্রদান করছে। ২রা এপ্রিল ২০১০ তারিখে প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন।

অটিজম কর্নার স্থাপন

১ অক্টোবর ২০১৩ অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী কর্নার স্থাপন করা হয়েছে প্রতিটি কেন্দ্রে।

ফ্রি স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম

অক্টোবর ২০১১ থেকে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে একটি অবৈতনিক স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়েছে। ১২০ জন শিক্ষার্থী সেখানে লেখাপড়া করছে।

ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস

২০১০ সালে প্রথমবারের মতো ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস চালু করা হয়।

কর্মজীবী প্রতিবন্ধী হোস্টেল

বর্তমান সরকার প্রথমবারের মতো ঢাকা মহানগরে ১৮ আসন বিশিষ্ট একটি কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ হোস্টেল এবং ১৪ আসন বিশিষ্ট একটি কর্মজীবী প্রতিবন্ধী মহিলা হোস্টেল চালু করে।

ভাতা কর্মসূচি: প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বর্তমান সরকার শিক্ষা উপবৃত্তি প্রতিবন্ধী ভাতা চালু করেছে।

প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপ

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজ সেবা অধিদপ্তর প্রতিবন্ধীতের ধরন ও মাত্রাসহ প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপ সম্পন্ন করেছে। ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশে ১৫.১০ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তালিকা করা হয়েছে এবং তাদের তথ্যাদি Disability Information system-এ এন্ট্রি করা হয়েছে। এছাড়াও ১০.০১ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র প্রদান করেছে।

প্রকাশনা কার্যক্রম

অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে জানুয়ারি ২০১৩ সাল থেকে 'আমরা করব জয়' শিরোনামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

লেখক : সমাজকর্মী

বিশেষ নিবন্ধ

৭ই এপ্রিল : বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস

সুস্থ মানবসম্পদ তৈরিতে সুষম খাদ্য

মো: আজগর আলী

মানুষের বেঁচে থাকার প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন খাদ্য। মানুষ ব্যক্তিগত ও দলবদ্ধভাবে খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে স্মরণাতীতকাল থেকে। চিন্তাশক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রকৃতিজাত খাদ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে নিজের হাতে ফসল উৎপাদন কৌশল আয়ত্ত করে আজ থেকে প্রায় নয় হাজার বছর পূর্বে। পরবর্তীতে ধাতুর ব্যবহার মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিস্ময়কর পরিবর্তন আনে। পরিবর্তন আনে খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতিতে। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে মুনাফাধর্মী বাণিজ্যের সার্থকতা, স্বাস্থ্যোপযোগী পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুতপ্রণালি ও গ্রহণ, পানীয় সংগ্রহের রীতি, সংরক্ষণ, রোগ-ব্যাধির কারণ, চিকিৎসা ও রোগ ভেদে পথ্য নির্বাচন প্রভৃতি মানুষের কেবল সুস্থ ও নিরোগ দেহ নিয়ে বেঁচে থাকার পরিচায়ক। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব কল্যাণে মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্য গ্রহণ বৈচিত্র্যপূর্ণতা একদিকে যেমন আমাদের রসনা বিলাসকে সমৃদ্ধ করেছে অন্যদিকে সুষম খাদ্য গ্রহণের দিক-নির্দেশনাও প্রদান করেছে। পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার অগ্রগতি শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি, মানসিক উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ১৯৯২ সালে রোমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলনে অপুষ্টিজনিত সমস্যা ও দীর্ঘমেয়াদি রোগের প্রকোপ হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি দেশের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক নিজস্ব খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা তৈরির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব সব নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা' এবং ১৮ (১) অনুচ্ছেদ অনুয়ায়ী 'জনগণের পুষ্টির স্তর- উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে'। বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করলেও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্যের সমারোহে একটি আদর্শ ও পরিপূর্ণ পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ বিধান করা এখনো একটি অন্যতম বড়ো অন্তরায়। শিশুর স্বাভাবিক বর্ধন ও বিকাশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে খাদ্য ও পুষ্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অস্বাস্থ্যকরভাবে প্রস্তুতকৃত খাবার শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশে শিশুর পুষ্টির জন্য ৬ মাস পর্যন্ত মায়ের দুধ পান এবং ১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়সি শিশুদের দৈনিক চাহিদা ৫৫০ ক্যালরি যা কি-না পরিপূরক খাবার থেকে আসে এবং তা গ্রহণের হার এখনো অপ্রতুল। ফলে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত, ঘন ঘন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত এবং মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছে। উপযুক্ত সম্পূরক খাবারের অপর্যাপ্ততার সাথে সাথে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের অন্যতম প্রধান কারণ হলো–শিশুর অভিভাবকরা জানেন না কী কী উপকরণ দিয়ে তৈরি খাবার শিশুর জন্য সঠিক। এক্ষেত্রে সকলের জানা দরকার খাবারে খাদ্যোপাদানের সঠিক অনুপাত, এ সম্পর্কিত জ্ঞান ও তথ্য যা কি না খাদ্যে বিভিন্ন পুষ্টি যোগান নিশ্চিত করে। বাংলাদেশের মানুষ বর্তমানে ২(দুই) রকমের অপুষ্টির শিকার: ১) খাদ্যের অভাবজনিত পুষ্টিহীনতা যথা– খর্বকায়, নিম্ন ওজন ও কৃশকায় ২) খাদ্য সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদি অসংক্রামক রোগসমূহ (Non-Communicable Diseases) –উচ্চ রক্তচাপ, করোনারি হার্ট ডিজিজ, স্ট্রোক, ক্যানসার, ডায়াবেটিস, স্থূলতা, অস্টিওপোরোসিস, হাইপোথাইরয়ডিজম, গ্লুকমা, মাসকিউলারডিস্ট্রফি প্রভৃতি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত Child and Mother Nutrition Survey of Bangladesh 2012, এর রিপোর্ট অনুযায়ী অপুষ্টির কারণে ৩৪% শিশু নিম্ন ওজন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। যাদের বয়স ৫ বছরের নিচে, খর্বাকৃতি ৪১.২%, কৃশকায় ১৩.৪%, স্থূলকার ৪.১% এবং মারাত্মক অপুষ্টিজনিত কারণে যথাক্রমে– নিম্ন ওজন ৮.১১%, খর্বাকৃতি ২৩.৪১%, কৃশকায় ৪.৮৬% ও স্থূলকার ১.৩০%। অন্যদিকে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভের (BDHS) ২০১৪ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যার এখনো এক তৃতীয়াংশের অধিক শিশু প্রোটিন ও ক্যালরিজনিত পুষ্টিহীনতায় ভোগে, যার মধ্যে ৫ বছরের নিচে খর্বাকৃতি ৩৬%, কৃশকায় ১৪%, ১৮ মাস থেকে ২৩ মাস বয়সের অধিকাংশ মারাত্মক কৃশকায় ১৭%, নিম্ন ওজনে রয়েছে ৩৩% এবং মারাত্মক নিম্ন ওজনে ৮%। গড়ে এক চতুর্থাংশ নারী দীর্ঘস্থায়ী ক্যালরিজনিত অপুষ্টিতে ভোগে, যার মধ্যে পল্লি অঞ্চলে ২১% ও শহরে ১২%। অপরদিকে পল্লি অঞ্চলের তুলনায় শহর অঞ্চলের মহিলাদের সুস্থতার হার বেশি যথাক্রমে– ১৯% ও ৩৬%। National Micronutrient Status Survey 2911-2012, icddr, UNICEF, GAIN and IPHN পরিচালিত প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, রক্তস্বল্পতায় ভোগে

তাজা ফলমূল

৫ বছরের নিচে বয়স এমন শিশু ৩৩.১%, নারী ২৬% এবং এদের অধিকাংশেরই দেহে একই সাথে জিংক ও আয়োডিনের মতো খনিজ উপাদানের ঘাটতি রয়েছে যথাক্রমে– ৫৭.৩% ও ৪২.১%। অপরপক্ষে, খাদ্য সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদি অসংক্রামক রোগসমূহের প্রকোপ (Non-Communicable Diseases) ক্রমেই বেড়ে চলছে। Health and Morbidity Survey 2014, BBS-এর রিপোর্টে এই হার ছিল– উচ্চ রক্তচাপ ১২.২৯%, ডায়াবেটিস ১০.৫১%, হার্ট ডিজিজ ৬.৫৯%, স্ট্রোক ১.৬৫%, আর্থ্রাইটিস ১৭.১৬%, রাতকানা ১.৩৩% এবং ক্যানসার ০.৭১%। আমরা প্রতিনিয়ত যে সকল খাদ্য গ্রহণ করে থাকি তাতে খাদ্যের উপাদানসমূহ যথাযথ পরিমাণে না থাকা বা অতিরিক্ত থাকা অপুষ্টি এবং দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রধান কারণ। খাদ্য তালিকায় সুষম খাদ্য নির্বাচন, গ্রহণকৃত খাদ্যদ্রব্যের গুণগতমান– এ সম্পর্কিত তথ্য ও নির্দেশিকা থাকলে দীর্ঘ মেয়াদি রোগগুলো সহজেই প্রতিরোধ করা সম্ভব। খাদ্য গ্রহণের সাথে জড়িত অপুষ্টি এবং খাদ্য সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদি রোগের হার হ্রাস করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, নিজস্ব খাদ্যাভ্যাসের সাথে মিল রেখে প্রতিটি দেশের একটি খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা থাকা আবশ্যক। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি ১৯৯৭-এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা প্রকাশ। পরবর্তীতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে Household Expenditure Survey (HIES (BBS) 2010 বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু দৈনিক খাদ্য গ্রহণ নীতি অনুসরণে ২০১১-২০১৩ সালে গবেষকদের সহায়তায় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করে এবং জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫-তে জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা প্রকাশকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অবশেষে ১৫ই নভেম্বর ২০১৫ খাদ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকায় বাংলাদেশের জনগণের পুষ্টি লক্ষ্যমাত্রা ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাত্রা সম্পর্কে ১০টি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকায় যা আছে তা হলো: ১. প্রতিদিন সুষম ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ; ২. পরিমিত পরিমাণে তেল ও চর্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ; ৩. প্রতিদিন সীমিত পরিমাণে আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ; ৪. মিষ্টিজাতীয় খাদ্য সীমিত পরিমাণে গ্রহণ; ৫. প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ পানি ও পানীয় পান; ৬. নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ; ৭. সুষম খাদ্য গ্রহণের পাশপাশি নিয়মিত শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে আদর্শ ওজন বজায় রাখা; ৮. সঠিক পদ্ধতিতে রান্না, সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং সুস্থ জীবনযাপনে নিজেকে অভ্যস্ত করা; ৯. গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে চাহিদা অনুযায়ী বাড়তি খাদ্য গ্রহণ; ১০. শিশুকে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধ খাওয়ানো এবং ৬ মাস পর বাড়তি খাদ্য প্রদান করা।

একটি পর্যাপ্ত এবং উন্নতমানের পরিপূরক খাবার প্রস্তুত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ৭টি খাদ্যশ্রেণির সমন্বয় দৈনিন্দন খাদ্য গ্রহণ হতে নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্যশ্রেনির সমন্বয় যথাক্রমে– ১. শস্য ও শস্যজাত খাবার: বাংলাদেশের মানুষ চাল ও গমের তৈরি খাবার বেশি গ্রহণ করে থাকে। গম থেকে তৈরি খাবার শরীরের অত্যাবশ্যকীয় খনিজ উপাদান যেমন– ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম, জিংক, কপার, ম্যাঙ্গানিজ এবং ভিটামিন বি-এর উৎকৃষ্ট উৎস। পরিশ্রম ভেদে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের প্রতিদিন ২৭০-৪৫০ গ্রাম চাল বা গম জাতীয় গ্রহণ করা উচিত। ২. আমিষ জাতীয় খাবার: দেহের বৃদ্ধি, কর্মক্ষমতা, রোগ প্রতিরোধ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাছ, মাংস, ডিম ও ডালজাতীয় খাবার দেহের ওজন অনুপাতে প্রতিদিন ৬০ গ্রাম গ্রহণ করা উচিত। ৩. শাক সবজি ও ফল জাতীয়: প্রতিদিন অন্ততপক্ষে

পার্কে শরীরচর্চায় রত বিভিন্ন বয়সি মানুষ

১০০ গ্রাম শাক বা ২০০ গ্রাম সবজি এবং ২টি মৌসুমি ফল (১০০ গ্রাম) যেমন ১টি চাপা কলা, ১টি আমড়া ইত্যাদি গ্রহণ করা উচিত। ৪. দুধ ও দুধ জাতীয়: হাড় ও দাঁতকে মজবুত রাখার ক্ষেত্রে দুধ ও দুধ জাতীয় খাবারের কোনো বিকল্প নেই। শরীরের সুস্থতার জন্য প্রতিদিন কমপক্ষে ১ কাপ (১৫০ মি.লি.) দুধ ও দুধ জাতীয় খাবার গ্রহণ করা উচিত। ৫. তেল ও চর্বি জাতীয়: দেহে শক্তি সরবরাহের জন্য তেল ও চর্বি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। তবে অধিক পরিমাণে এসব খাদ্য গ্রহণ করলে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং হৃদরোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। একটি আদর্শ খাদ্য তালিকায় প্রতিদিন জনপ্রতি (প্রাপ্তবয়স্ক) গড়ে ৩০-৪৫ মি.লি. বা ২-৩ টেবিল চামচ তেল চর্বি থাকা উচিত। ৬. খনিজ লবণ: খাদ্যে পরিমিত পরিমাণ আয়োডিন থাকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন জনপ্রতি ১ চা চামচ পরিমাণ আয়োডিন থাকা দরকার। ৭. পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপদ পানি: পানীয় ও পানি খাদ্য পরিপাক, পরিশোষণ, পরিবহণ, বর্জ্য পদার্থ নিঃসরণ এবং শরীরের তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন। শারীরিক পরিশ্রম, ভৌগলিক অবস্থান এবং তাপমাত্রার প্রভাবে শরীরে পানির চাহিদা কম-বেশি হয়ে থাকে। প্রতিদিন দেহের ওজন অনুপাতে জনপ্রতি ১.৫-৩.৫ লিটার বা ৬-১৪ গ্লাস নিরাপদ পানি পান করা আবশ্যক।

দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় শুধু মানসম্মত খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করলেই চলবে না, এর জন্য সঠিক পদ্ধতিতে রান্না, খাদ্যাভ্যাস এবং সুস্থ জীবনযাপনেও নিজেকে অভ্যস্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে যা করণীয় যেমন– শাকসবজি রান্নার জন্য উচ্চ তাপে ও কম সময়ে রান্নার পদ্ধতি অনুসরণ করা, শাক সবজি ও ফল কাটার পর খোলা অবস্থায় না রাখা, রান্নার সময় ঢাকনা ব্যবহার করা, রান্নায় ব্যবহৃত ভোজ্য তেল পুনঃব্যবহার না করা, সময়মতো খাদ্য গ্রহণ করা, মৌসুমি ফল গ্রহণ করা, পরিমিত খাওয়া, সম্ভব হলে ফাস্ট ফুড, বেকারি ফুড, জাংক ফুড ও কোমল পানীয় পরিহার করা, খাওয়ার আগে, খাওয়ার পরে, পায়খানা ব্যবহারের পরে এবং যে-কোনো কাজে বাইরে থেকে বাড়িতে ঢুকে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস করা, দৈনিক ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমানোর অভ্যাস করা ও শারীরিক শ্রমের সমন্বয়ে আদর্শ ওজন বজায় রাখার জন্য সাধ্যমতো ব্যায়াম অনুশীলনও করতে হবে। যাহোক, খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা বাংলাদেশের জনগণের পুষ্টিগত উন্নয়ন, পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত রোগগুলো প্রতিরোধ করা, খাদ্যাভ্যাসের সাথে সম্পর্কিত দীর্ঘমেয়াদি রোগগুলো প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে করা হয়েছে।

লেখক : কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আগারগাঁও, ঢাকা।

নিবন্ধ

জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ ফলমূল

সম্পাদনা বিভাগ

বাংলাদেশে এখন গ্রীষ্মকাল। ফলের মৌসুম চলছে। মৌসুমী ফলে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণ জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। দেশ-বিদেশে বাংলাদেশের আম-লিচুর সুখ্যাতি রয়েছে। এজন্য মৌসুমী ফলকে জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ করা খুবই জরুরি। লিচু ও আমের সুখ্যাতি রক্ষা করা, চাষিদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা এবং ভোক্তাদের বাংলাদেশের আমসহ অন্যান্য ফল খেতে উৎসাহিত করার জন্য এ সকল মৌসুমী ফলে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণ রোধ করা প্রয়োজন। পণ্য উৎপাদনকারী, ফসল উৎপাদনকারী, আম-লিচু চাষি ও বিক্রেতাসহ আমরা সকলে কোনো না কোনোভাবে ভোক্তা। খাদ্যে ভেজাল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক মিশ্রণের কারণে বিক্রেতা সাময়িক লাভবান হলেও সকল ভোক্তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রতারিত হয়ে থাকেন।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯

ধারা-২৯ : মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পণ্যসামগ্রী উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদির ওপর বাধা-নিষেধ : কোন পণ্য মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর বলিয়া প্রমাণিত হইলে , মহাপরিচালকের পরামর্শক্রমে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সমগ্র দেশে বা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় এইরূপ পণ্যের উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহণ বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিবার বা প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত শর্তাধীনে ঐ সকল কার্যক্রম পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নির্দেশ জারী করিতে পারিবে।

ধারা-৩৬ : ভেজাল পণ্যের সরাসরি আটক ও নিষ্পত্তি : এই আইনের অধীন গৃহীত কোন অনুসন্ধান, তদন্ত বা বিচার কার্যক্রমে যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন পণ্য দৃশ্যত ভেজাল এবং মানুষের খাদ্য হিসেবে ভক্ষণের অযোগ্য বা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, এবং অনুরূপ অভিযোগ প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত হয় বা অস্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে উক্ত পণ্য সরাসরি আটক করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবহার, হস্তান্তর, ধ্বংস বা অন্য কোন প্রকারে বিলি বন্দোবস্ত করা যাইবে।

ধারা-৪২ : খাদ্যপণ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্যের মিশ্রণের দণ্ড : মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন দ্রব্য, কোন খাদ্যপণ্যের সহিত যাহার মিশ্রণ কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, কোন ব্যক্তি উক্তরূপ দ্রব্য কোন পণ্যের সহিত মিশ্রিত করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা-৪৩ : অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণের দণ্ড: কোন ব্যক্তি মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন কোন প্রক্রিয়ায়, যাহা কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, কোন পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ করিলে তিনি অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার আম পরিপক্ক হওয়ার সময়পঞ্জি বা ক্যালেন্ডার	
আমের নাম /জাত	**পরিপক্ক হওয়ার সর্বপ্রথম সময়কাল**
গোবিন্দভোগ	মে মাসের শেষ সপ্তাহ/২০ মে'র পর
গুলাবখাস	জুনের প্রথম সপ্তাহে /৩০ মে'র পর
গোপালভোগ	জুনের প্রথম সপ্তাহ /১ জুনের পর
রানিপছন্দ	জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ/৫ জুনের পর
ল্যাংড়া	মধ্য জুন/১৫ জুনের পর
হিমসাগর/ক্ষীরশাপাত/ হাঁড়িভাঙ্গা/মিছরিভোগ	জুনের তৃতীয় সপ্তাহ/২০ জুনের পর
আম্রপালি/মল্লিকা	জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ/১ জুলাই থেকে
ফজলি	জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহ/৭ জুলাই থেকে
আশ্বিনা	জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ/২৫ জুলাই থেকে
এই সময়পঞ্জি অনুযায়ী পাকা আম কিনলে প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।	

ক্ষতিকর রাসায়নিক প্রয়োগ বন্ধের লক্ষ্যে আম পরিপক্ক হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের আগে কাঁচা আম পাড়া ও বিক্রি থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন।

জনস্বাস্থ্যের ক্ষতিকর দিক ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি

- ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ বিভিন্ন প্রকার বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে কৃত্রিমভাবে ফল পাকানো ও রং আকর্ষণীয় করায় ফলের স্বাদ, পুষ্টি ও খাদ্যমান বিনিষ্ট হচ্ছে।
- ক্ষতিকর রাসায়নিক মিশ্রিত ফল খেলে বদহজম, পেটের পীড়া , পাতলা পায়খানা, জন্ডিস, গ্যাস্টিক , শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা, লিভার সিরোসিস, কিডনি বিকল, ক্যানসারের মতো দুরারোগ্য রোগ হতে পারে।
- গর্ভবতী নারীরা এসব ফল খেলে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হতে পারে।
- বিষাক্ত রাসায়নিকযুক্ত ফল কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

ফল চাষিদের করণীয়

- চাষি পর্যায়ে আম, লিচুসহ বিভিন্ন ফলে মাত্রাতিরিক্ত বালাইনাশক স্প্রে করা হতে বিরত থাকা দরকার।
- ফলগাছে বালাইনাশক প্রয়োগ করার পূর্বে নিকটস্থ কৃষি অফিস বা ব্লকের সহকারী কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।
- জরুরি সমস্যা সমাধানে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার বা ইউডিসি'র উদ্যোক্তার মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ভোক্তাদের করণীয়

- বাজার থেকে টকটকে আকর্ষণীয় রঙের ফল ক্রয়ে বিরত থাকা দরকার।
- খাদ্যে ভেজাল অথবা ক্ষতিকর রাসায়নিক মিশ্রণের যে-কোনো ঘটনা নজরে আসলে সাথে সাথে তা নিকটতম উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির সদস্য, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ অথবা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অবহিত করা প্রয়োজন।

ব্যবসায়ীদের করণীয়

- ব্যবসায়ীদের নিজস্ব উদ্যোগে জেলার সকল ফলের আড়ত/ব্যবসা কেন্দ্রে ফরমালিন ও কার্বাইড মুক্ত ফল বিক্রি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- জনপ্রতিনিধি, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, ছাত্র, শিক্ষক, স্কাউট, সুশীল সমাজ ও চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় বাজার কমিটির সমন্বয়ে ফরমালিন ও কার্বাইড মুক্ত ফল বিক্রি মনিটরিং করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- বাজারের সুনাম রক্ষার্থে কৃত্রিম উপায়ে বা ক্ষতিকর রাসায়নিক প্রয়োগ করে ফল পাকানো ও বিক্রি বন্ধে ব্যবসায়ীদের সচেতন করা দরকার।

জনস্বাস্থ্যের হুমকি প্রতিরোধকল্পে খাদ্যে ভেজাল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা খুবই জরুরি।

তথ্যসূত্র : জেলা তথ্য অফিস ও জেলা প্রশাসন, দিনাজপুর

হাইটেক পার্ক

সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

ফজলে রাব্বি খান

হাইটেক পার্ক সাম্প্রতিক সময়ের একটি অন্যতম আলোচিত শব্দ। উন্নত বিশ্বের প্রতিটি দেশেই প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প ও সেবা সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির ক্রমবিকাশ ও টেকসইকরণের লক্ষ্যে হাইটেক পার্ক নির্মাণের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। মূলত হাইটেক পার্ক হলো একটি প্রযুক্তিনির্ভর বিশেষায়িত শিল্পাঞ্চল, যেখানে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানসমূহের সুবিধার্থে সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। সহজভাবে বুঝাতে গেলে, ইপিজেড, বেপজা, বিসিক শিল্পনগরীর মতো হাইটেক পার্ক একটি বিশেষায়িত শিল্পাঞ্চল যেখানে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপাদনমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করবে। যে-কোনো শিল্পক্ষেত্রের পূর্ণ বিকাশের মূল শর্ত এর সহায়ক অবকাঠামো ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ। বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় তথ্যপ্রযুক্তি খাতের ক্রমবিকাশ অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সকল অবকাঠামো প্রদান ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মাধ্যমে এই শিল্পকে টেকসই করার জন্য হাইটেক পার্ক নির্মিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির জন্য একটি সম্ভাবনাময় দেশ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর ভেতরে বাংলাদেশের প্রযুক্তি বাজার সবচেয়ে দ্রুত হারে বর্ধনশীল। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ২,৫০,০০০ তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবী ৮০০-র বেশি প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে। প্রায় ১৬০টির বেশি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বৈদেশিক বাজারে প্রযুক্তিনির্ভর সেবা প্রদানের মাধ্যমে রেমিট্যান্স আয়ে অবদান রাখছে। আন্তর্জাতিক টাইমজোনে বাংলাদেশের অবস্থান জিএমটি+৬, যা আমাদের আউটসোর্সিং শিল্পের জন্য একটি সহায়ক শক্তি। এছাড়াও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭ এর বেশি অব্যাহত থাকা, দেশীয় প্রযুক্তি, পেশাজীবীদের প্রযুক্তি ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা ইত্যাদি কারণে বিদেশিদের কাছে বাংলাদেশ 'নেক্সট আইটি ডেসটিনেশন' হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বাংলাদেশের প্রযুক্তি খাতের অবকাঠামো ও শ্রম ব্যয়ের তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, আমাদের দেশে ইন্টারনেট ব্যয় ১.২ ইউএস ডলার (প্রতি গিগাবাইট), প্রতি স্কয়ার ফিট অফিস ভাড়া ও প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ খরচ যথাক্রমে ০.৬০ ও ০.১৩ ইউএস ডলার। বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবীর প্রারম্ভিক গড় মাসিক বেতন ২৭৩ ইউএস ডলার, যেখানে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, শ্রীলঙ্কা ও মালয়েশিয়ায় এ ব্যয় যথাক্রমে ৫৭০, ৩০৯ ও ৯৯১ ইউএস ডলার। অবকাঠামো ও শ্রমশক্তি ব্যয় অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এসকল কারণে বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর খাত বিকশিত হবার জন্য রয়েছে ব্যাপক সম্ভাবনা এবং একই কারণে আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি বাজার ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)-এর তথ্যমতে, ২০১৬ সালে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি

খাতে রপ্তানি আয় ছিল ৭০ কোটি ইউএস ডলার। এই খাত থেকে ২০১৮ সালে ১ বিলিয়ন এবং ২০২১ সালে ৫ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এসকল সম্ভাবনা বাস্তবায়নে হাইটেক পার্ক নির্ভর প্রযুক্তি শিল্প গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশব্যাপী ২৮টি বিভিন্ন পর্যায়ের হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি ইনকিউবেশন সেন্টার গড়ে তোলার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য হাইটেক পার্কসমূহের বর্তমান চিত্র

কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক : গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন হাইটেক পার্কটি ৩৫৫ একর জমির উপর নির্মাণাধীন রয়েছে। এই পার্কটি সম্পূর্ণভাবে চালু হলে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৭০ হাজার ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৫০-৬০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ককে বিশ্বমানের করার জন্য প্রকল্প এলাকায় আবাসিক সুবিধা, ডরমেটরি, কনভেনশন সেন্টার, হাসপাতাল, জিমনেশিয়াম, শপিং সেন্টারসহ সকল আধুনিক নাগরিক সুবিধা সংযোজিত হবে। কালিয়াকৈর হাইটেক পার্কের ৩০ হাজার স্কয়ার ফিট অফিস স্পেস ইতোমধ্যে বরাদ্দের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক

যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক : প্রায় ১২.১৩ একর জমির উপর যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের নির্মাণ কাজ ২০১৭ সালের জুন মাসের ভেতর সম্পন্ন হবার কথা রয়েছে। এই পার্কে ১৫ তলা ম্যানেজমেন্ট ভবন, ১২ তলা ডরমেটরি ভবন এবং ৩ তলা ক্যান্টিন ও এমপিথিয়েটারের নির্মাণ কাজ শেষ হলে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ১০ হাজার ও পরোক্ষভাবে ৫-৬ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত পার্কের ৫৬ হাজার স্কয়ারফিট স্পেস বরাদ্দ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সিলেট ইলেকট্রনিক সিটি : প্রায় ১৬৩ একর জায়গায় ২০১৬ সালে সিলেট ইলেকট্রনিক সিটির স্থাপনা নির্মাণ শুরু হয়েছে। মূলত হার্ডওয়্যার ও টেলিকম শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই হাইটেক পার্কটি নির্মিত হচ্ছে। এই পার্কটি বাস্তবায়িত হলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

সিলেট ইলেকট্রনিক সিটি

বরেন্দ্র সিলিকন সিটি, রাজশাহী : প্রায় ৩৪ একর জায়গার ওপর তথ্যপ্রযুক্তি, প্রযুক্তি বিষয়ক সেবা এবং টেলিকম শিল্পের উপর প্রাধান্য দিয়ে রাজশাহীতে গড়ে উঠছে বরেন্দ্র সিলিকন সিটি। ইতোমধ্যে বরেন্দ্র সিলিকন সিটিতে অফিস বরাদ্দ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, জনতা টাওয়ার : রাজধানীর কারওয়ান বাজারে জনতা টাওয়ারকে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ৭২০০০ স্কয়ার ফিট এই ভবনে ইতোমধ্যে বিভিন্ন সফটওয়্যার কোম্পানি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও নতুন উদ্যোক্তাদের এই ভবনে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশেষ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

দেশীয় তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর শিল্পকে শুধুমাত্র রাজধানীনির্ভর এক কেন্দ্রিক না করে দেশব্যাপী বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলাভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এজন্য অবকাঠামো উন্নয়ন ও আইটি/আইটিইএস শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিশেষ আইসিটি ইনকিউবেশন সেন্টার গড়ার উদ্দেশ্যে গোপালগঞ্জ সদর, ময়মনসিংহ সদর, জামালপুর সদর, ঢাকার কেরানীগঞ্জ, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, চট্টগ্রাম বন্দর, কক্সবাজারের রামু, রংপুর সদর, নাটোরের সিংড়া, সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ, কুমিল্লা সদর, খুলনার কুয়েটে একই ডিজাইনে আইটি পার্ক নির্মাণের লক্ষ্যে '১২ আইটি পার্ক স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এসকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর দেশব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি খাতে উল্লেখযোগ্য গুণগত পরিবর্তন আসবে।

বাংলাদেশের উদীয়মান তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে টেকসই করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১২৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার ব্যয়ে নানাবিধ সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ তথ্যপ্রযুক্তি বাজার প্রায় ১৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলার। প্রতি বছর ১০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা সম্পন্ন করে কর্ম বাজারে প্রবেশ করছে। এসকল তথ্য তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সম্ভাবনার কথাই প্রকাশ করে। প্রযুক্তি শিল্পের সকল সম্ভাবনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের জীবনযাত্রা ও অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবে– নাগরিক হিসেবে এই প্রত্যাশাই আমাদের সকলের।

লেখক : প্রকৌশলী

নিবন্ধ

অগ্নি দুর্ঘটনা ভূমিকম্প ও বজ্রপাতে করণীয়

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন

পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ স্বাভাবিক ঘটনা। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে আমরা খুবই পরিচিত। এসকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করে দুর্যোগ পরবর্তী দ্রুততর সময়ে জনজীবন স্বাভাবিক করার বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, এনজিও ও জনগণ একসাথে কাজ করে। এদেশের সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশল বিভিন্ন উন্নত দেশের জন্য মডেল। তবে অগ্নি দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প ও বজ্রপাতের মতো দুর্ঘটনা মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের পাশাপাশি জনগণের ব্যাপক সম্পৃক্ততা জরুরি।

অগ্নি দুর্ঘটনা

চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ– এ তিনমাস প্রচণ্ড গরম পড়ে। উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহে উত্তপ্ত পরিবেশে পৃথিবীর অনেক দেশের বনাঞ্চলে দাবদাহে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ প্রতিবছর পাওয়া যায়। আমাদের দেশে গ্রীষ্মের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় দাবদাহ সৃষ্টির নজির খুব একটা নেই। তবে এসময় রান্নার চুলা, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট বা সিগারেটের পরিত্যক্ত অংশ থেকে অসাবধানতাজনিত কারণে খড়ের গাদা, কাঁচা-পাকা ঘরবাড়ি ও শিল্পকারখানায় আগুন লেগে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে প্রায়ই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। অথচ সকলে একটু সচেতন হলে এবং কিছু ছোটো ছোটো কাজ করলে গ্রীষ্মকালে অগ্নি দুর্ঘটনা এবং এর ক্ষয়ক্ষতি সহজেই হ্রাস করা যায়।

অগ্নি দুর্ঘটনা মোকাবিলায় করণীয়

- রান্নার পর চুলার আগুন সম্পূর্ণ নিভিয়ে ফেলতে হবে।
- বিড়ি বা সিগারেটের জ্বলন্ত অংশ নিভিয়ে নিরাপদ স্থানে ফেলতে হবে।
- খোলা বাতির ব্যবহার কমিয়ে দিতে হবে।
- অভিজ্ঞ ইলেকট্রিশিয়ান দ্বারা নিয়মিত ভবনের বৈদ্যুতিক ক্যাবল ও ফিটিংস পরীক্ষা করতে হবে।
- হাতের কাছে সব সময় দুই বালতি পানি বা বালু মজুদ রাখা জরুরি।
- বাসগৃহ, অফিস কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপণী যন্ত্র স্থাপন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তা ব্যবহার করা জানতে হবে।
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স থেকে অগ্নি প্রতিরোধ, নির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- প্রতিটি শিল্পকারখানা ও সরকারি-বেসরকারি ভবনে অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন ২০০৩ ও বিধিমালা ২০১৪ অনুযায়ী অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন অবশ্যই জরুরি।
- স্থানীয় ফায়ার স্টেশনের ফোন নম্বর সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে। যে-কোনো জরুরি অবস্থায় সাহায্যের জন্য দ্রুত সংবাদ দিতে হবে।
- রোগী পরিবহণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অ্যাম্বুলেন্স সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।

অগ্নি নির্বাপণ

ভূমিকম্প

হিমালয় সংলগ্ন বাংলাদেশের তলদেশে তিনটি টেকটোনিক প্লেটের সংযোগ ঘটেছে। ভূ-প্রাকৃতিক নানা কারণে এসকল টেকটোনিক প্লেট বিভিন্ন সময় নড়াচড়া করে। এসব প্লেটের সামান্য নড়াচড়ার ফলে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে কম্পন অনুভব হয়, যাকে আমরা ভূমিকম্প বলি। ভূমিকম্পের মাত্রা, উৎপত্তিস্থল থেকে দূরত্ব ও স্থায়িত্বের উপর ক্ষয়ক্ষতির ধরন ও পরিমাণ নির্ভরশীল। কখনো কখনো একটি ভূমিকম্পের পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আরো একাধিক ছোটো ছোটো ভূমিকম্প হতে দেখা যায়, যা আফটার শক নামে পরিচিত। এই আফটার শকেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্প ব্যাপক জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে, যা সাধারণভাবে সুনামি নামে পরিচিত। সুনামির ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা ভূমিকম্প থেকে বেশি হয়ে থাকে। সম্প্রতি প্রতিবেশী দেশ নেপালে ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ইদানীং আমাদের দেশে ঘন ঘন ভূমিকম্প হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ভূমিকম্পের কোনো সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয় না, ফলে অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো ভূমিকম্প মোকাবিলায় প্রস্তুতির সময় পাওয়া যায় না। এজন্য ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় ভূমিকম্পজনিত প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে পূর্বপ্রস্তুতির উপর বিজ্ঞানীগণ জোর দিয়ে থাকেন। ব্যাপক জনসচেতনতা ও পূর্বপ্রস্তুতির ফলে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস করা সম্ভব।

ভূমিকম্প মোকাবিলায় করণীয়

- ভূমিকম্প অনুভূত হলে আতঙ্কিত বা দিশেহারা না হওয়া। ভবনের

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা

নিচতলায় থাকলে দ্রুত বাইরে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসতে হবে।

- ভবনের উপরতলায় থাকলে কক্ষের নিরাপদ স্থান যেমন– শক্ত খাট বা টেবিলের নিচে, বিম বা কলামের পার্শ্বে অথবা রুমের কর্নারে আশ্রয় নিতে হবে। বসে পড়তে হবে এবং বালিশ, কুশন, হেলমেট বা দুহাত মাথার উপরে দিয়ে মাথা সুরক্ষিত করতে হবে।
- ভূমিকম্পের প্রথম ঝাঁকুনির পর পুনরায় ঝাঁকুনি হতে পারে। সুতরাং একবার বাইরে বেরিয়ে এলে নিরাপদ অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত ভবনে পুনরায় প্রবেশ করা যাবে না।
- কোনো বিধ্বস্ত ভবনে আটকা পড়লে এবং উদ্ধারকারীগণ ডাক শুনতে না পেলে শক্ত কোনো কিছু দিয়ে দেয়ালে বা ফ্লোরে জোরে জোরে আঘাত করে উদ্ধারকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করতে হবে।
- ভূমিকম্পকালীন আশ্রয়স্থলে শুকনো খাবার, পানি, ব্যাটারিচালিত টর্চ, বাঁশি ও প্রদর্শনের জন্য লাল কাপড় ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।
- ভূমিকম্প নিজে মানুষকে আঘাত করে না। মানুষের তৈরি ঘরবাড়ি বা দুর্বল স্থাপনা ভেঙে পড়ে মানুষ হতাহত হয়। তাই বিল্ডিং কোড অনুসরণ করে ভবন নির্মাণ করে, ভূমিকম্পের ঝুঁকি হ্রাস করতে হবে।
- ভূমিকম্পের আগাম পূর্বাভাস দেওয়ার কোনো যন্ত্র এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। সুতরাং সচেতনতা এবং পূর্বপ্রস্তুতিই ভূমিকম্প মোকাবিলার সর্বোত্তম উপায়।

বজ্রপাত

গ্রীষ্মকালে বজ্রসহ বৃষ্টিপাত বাংলাদেশের সকল এলাকায় খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা। এসময় হঠাৎ করে কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গিয়ে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকানোর সাথে সাথে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়। এটি কালবৈশাখি ঝড় নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত। বিদ্যুৎ চমকের পরপরই প্রচণ্ড গর্জনে বজ্রপাত এ ঝড়ের বৈশিষ্ট্য। আমাদের দেশে বড়ো বড়ো গাছ কর্তন, ব্যাপক শিল্পায়ন ও বায়ু দূষণ এবং মোবাইল নেটওয়ার্কের বিস্তৃতির ফলে বজ্রপাতে ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবছর বজ্রপাতে প্রাণহানির খবর পাওয়া যাচ্ছে। বজ্রপাতকে সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে দুর্যোগের সিডিউলভুক্ত করেছে। অল্প কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলে বজ্রপাতে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব। এজন্য ব্যাপক জনসচেতনতা জরুরি।

বজ্রপাতকে ভয় নয়, জয় করুন

মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান

বজ্রপাতের সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। প্রতিবছরই বজ্রপাত কিছু সম্পদহানির কারণ হয়। ২০১৫ সালে এতে ১৭ জনের মৃত্যু হয়। বিগত ২৭ আগস্ট ২০১৫ সালে বজ্রপাত দুর্যোগ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। ২০১৬ সালে দেশে বজ্রাঘাতে ৩ শতাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। সংশ্লিষ্ট আবহাওয়াবিদ, বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের নিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর কারণ, প্রতিকার ও করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন। সাধারণ জনগণের কাছে করণীয়ই মুখ্য বিষয়। তাই সচেতন ও সতর্কতা অবলম্বনের জন্য করণীয়গুলো তুলে ধরছি।

- আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখা দিলে বজ্রপাতের আশঙ্কা তৈরি হয়। এ সময়ে ঘরে অবস্থান করাই শ্রেয়।
- এ সময় খুব প্রয়োজন হলে রাবারের জুতা পরে বাইরে যাওয়া যেতে পারে।
- বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, খোলা মাঠ বা উঁচু স্থানে থাকবেন না। কারণ বজ্রপাত উপর থেকে পতিত হয়ে উচু জায়গাতেই আঘাত হানে।
- এ সময় ধানক্ষেত বা খোলা মাঠে থাকলে তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে, কানে হাত দিয়ে, মাথা নিচু করে বসে পড়ুন। হাতের কাছে পলিথিন জাতীয় কিছু থাকলে মাথায় প্যাঁচিয়ে নিন।
- যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন। টিনের চালা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন। কারণ টিন বিদ্যুৎ পরিবাহী।
- উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক তার বা ধাতব খুঁটি, মোবাইল টাওয়ার থেকে দূরে থাকুন।
- বজ্রপাতের সময় গাড়ির ভেতর অবস্থান করলে, গাড়ির ধাতব অংশের সাথে শরীরের সংযোগ রাখবেন না। সম্ভব হলে গাড়িটি নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন।
- বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি বা বারান্দায় থাকবেন না।
- ঘরের জানালা বন্ধ রাখুন এবং ঘরের ভেতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকুন।
- মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ল্যান্ডফোন, টিভি, ফ্রিজসহ সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন এবং এগুলোর সুইচ বন্ধ রাখুন।
- এ সময় ধাতব হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করবেন না। খুব প্রয়োজনে প্লাস্টিকের অথবা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করতে পারেন।
- এ সময় খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত থাকুন।
- ছাউনিবিহীন নৌকায় মাছ ধরতে যাবেন না, তবে বজ্রপাতের সময় নদীতে থাকলে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করুন।
- বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করবেন না।
- আপনার নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে প্রতিটি ভবনে বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন নিশ্চিত করুন।

বজ্রপাত ঝুঁকি হ্রাসে পদক্ষেপ

বজ্রপাতে প্রস্তুতি সম্পর্কে জনগণকে জানানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ দুর্ঘটনা থেকে বাঁচাতে পারে:

- যখনই বজ্রধ্বনি কানে আসবে, সর্তক হতে হবে, ঘরের ভেতরে যেতে হবে এবং অবস্থান করতে হবে।
- ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন আগুনের জায়গা, রেডিয়েটর, স্টোভ, ধাতব পাইপ, জলমগ্ন স্থান/ পানি এবং ফোন থেকে দূরে থাকতে হবে।
- ট্রাক্টর যান্ত্রিক লাঙল এবং যানবাহন থেকে নেমে পড়তে হবে এবং আশ্রয়স্থলে গিয়ে অবস্থান করতে হবে।
- গাছের নিচে আশ্রয় নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
- পর্বতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকলে যতদূর সম্ভব সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসে কুণ্ডলিকৃত দড়ি, ক্যাম্পিং ম্যাট্রেস-এ বসে পড়তে হবে।

বজ্রপাতকালীন যেসব বিষয় জানা অতিব প্রয়োজন

- বজ্রপাতকালীন বাইরের কোনো জায়গা নিরাপদ নয়।
- বজ্রধবনি শোনা গেলে মনে করতে হবে বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে।
- বজ্রধ্বনি শোনার পর অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে হবে।
- বজ্রধ্বনির পর কমপক্ষে ৩০ মিনিট নিরাপদ স্থানে অবস্থান করতে হবে।

বজ্রপাতকালীন ঘরের ভেতরের নিরাপত্তা

- সরাসরি বিদ্যুৎ লাইনের সাথে সংযুক্ত সকল ধরনের কর্ডেট ফোন, কম্পিউটার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বন্ধ করা ও বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা আবশ্যক।
- বাথটাবে জলমগ্ন হওয়া ও শাওয়ারে গোসল করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- জানালা এবং দরজা থেকে দূরে অবস্থান করা আবশ্যক।
- সরাসরি শক্ত মেঝেতে ঘুমানো এবং শক্ত দেয়ালে হেলান দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তায় করণীয়

১. আগাম বাসা থেকে বের হওয়ার সময় নিরাপত্তার পদক্ষেপ বিষয়ে পরিকল্পনা করতে হবে। বজ্রবিদ্যুৎ দেখা অথবা বজ্রধবনি শোনার পর পূর্বের পরিকল্পিত জরুরি বিষয় বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. ঘরের বাইরে থাকলে এ সময় পানি, উঁচু তলা, ফাঁকা জায়গা পরিত্যাগ করতে হবে। সকল ধরনের ধাতব পদার্থ বিশেষ করে বৈদ্যুতিক তার, বেষ্টনী, যন্ত্রপাতি, মোটর, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি থেকে দূরে থাকতে হবে। শামিয়ানার নিচে, ছোটো বনভোজন ছাউনি অথ বা বৃষ্টির ছাউনি অথবা গাছের নিচে আশ্রয় নেয়া যাবে না। যথাসম্ভব মজবুত স্থাপনা অথবা সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ ধাতুনির্মিত যানবাহন যেমন কার, ট্রাক, ভ্যানের জানালা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা যায় এমন নিরাপদ জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। বাইরে অবস্থানকালীন যদি বজ্রবিদ্যুৎ নিকটতম জায়গায় ঘটে, তবে উচিত:

- **নত হওয়া:** চরণযুগল একসাথে রেখে, হাত দুটি কানের উপরে রাখতে হবে যাতে, বজ্রধ্বনি শোনা থেকে কানকে যথাসম্ভব বিরত রাখা যায়।

বজ্রবিদ্যুৎ

- **পরিত্যাগ করা:** পাশাপাশি/কাছাকাছি থাকলে একজনের থেকে আর একজন কমপক্ষে ১৫ ফুট দূরে থাকতে হবে।

৩. ঘরের মাঝে থাকলে পানি পরিত্যাগ করতে হবে। দরজা এবং জানালা থেকে দূরে অবস্থান করতে হবে। টেলিফোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। এয়ার ফোন নামিয়ে ফেলতে হবে। প্রায়োগিক যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং টেলিভিশন বন্ধ করার পাশাপাশি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। বজ্রবিদ্যুৎ বাইরের বৈদ্যুতিক এবং ফোন লাইনে আঘাত করতে পারে, যা তারের মধ্য দিয়ে ঘরের বৈদ্যুতিক ডিভাইসের মাধ্যমে ঘরে সঞ্চারিত হতে পারে।

৪. সর্বশেষ বজ্রবিদ্যুৎ বা বজ্রধ্বনির পর কমপক্ষে ৩০ মিনিট কাজ থামিয়ে রাখতে হবে।

৫. বজ্রপাতে আঘাতপ্রাপ্ত লোকেরা বৈদ্যুতিক চার্জ বহন করতে পারে না। উপযুক্ত জ্ঞান থাকলে বজ্রবিদ্যুতের শিকার ব্যক্তিগণকে প্রাথমিক সেবা দেওয়া যেতে পারে। জরুরি ভিত্তিতে ৯১১-এ কল করা অথবা সাহায্যের জন্য কাউকে হাসপাতালে বা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিসে প্রেরণ করা যেতে পারে।

৬. এছাড়া জরুরি টেলিফোন নম্বরগুলো পূর্বেই জেনে রাখতে হবে।

প্রতিকার

- প্রতিটি ঘর বা ভবনে বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন করে ইনসুলেটেড তার দিয়ে মাটির গভীরে সংযুক্ত করতে হবে।
- তালগাছ, দেবদারু গাছসহ সুউচ্চ গাছ বাড়িতে, রাস্তার মোড়ে ও ফসলের মাঠের আলে লাগাতে হবে। এর ফলে বজ্রপাত থেকে প্রাণ ও সম্পদ রক্ষা পাবে।
- মোবাইল নেটওয়ার্ক বজ্রাঘাতে সহায়তা করে। তাই বজ্রপাতের সময় মোবাইল বন্ধ রাখা খুবই জরুরি।

অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প ও বজ্রপাতের পূর্ব সংকেত দেওয়ার তেমন সুযোগ নেই। এজন্য প্রয়োজন ব্যাপক জনসচেতনতা। সরকারের একার পক্ষে জনমত তৈরি করা সম্ভব নয়, এক্ষেত্রে মিডিয়া, সুশীল সমাজ, জনপ্রতিনিধিসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আসুন, আমরা সবাই সচেতন হই, সতর্কতা অবলম্বন করি, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প ও বজ্রাঘাতের হাত থেকে নিজেকে, পরিবার পরিজনকে ও সহায়-সম্বল রক্ষা করি।

লেখক: সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ, ডিএফপি, ঢাকা।

রমণী-ঘরনি-জননীর মন

মিনা মাশরাফী

মায়ের মুখটা গম্ভীর দেখে সুমেরার বড়ো ভয় ভয় করছে। ধীর পায়ে আপুর কাছে গিয়ে বলল : আপু মা'র কী হয়েছে?

সায়রা বলল, কেন রে, মা'র কিছু হয়েছে, কী করে বুঝলি?

স্কুল থেকে ফিরে দেখি মা খুব গম্ভীর হয়ে আছে তো তাই। আজ বিকেলে মা আমার চুল বেঁধে দেয় নাই, ড্রেস পালটে মাঠে খেলতে যেতে বলে নাই। বুয়াকে বলেছে আমাদের বিকালের নাস্তা টেবিলে দিয়ে দিতে।

সায়রা : ও তাই? বাবা মনে হয় কিছু বলেছে। বাবা সব সময় মাকে সব কিছুর জন্য দোষারোপ করে, অথচ মা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সবদিক সামলায়। বাড়ির কাজ, বাইরের কাজ, নিজের চাকরি, আমাদের খোঁজখবর, লেখাপড়া–সব মা তো একাই করেন। আর বাবা অফিস থেকে ফিরে বিকেলের চা-নাস্তা খেয়ে অফিসার্স ক্লাবে যায়, রাত দশটায় বাসায় ফিরে মা'র উপর আবার তদারকি শুরু করেন– ভাইয়া কোথায়, এখনো বাসায় ফেরেনি কেন? বিপুল ভাইয়া তো বাসায় থাকে না, অনেক রাতে চুপিচুপি করে ফেরে। সেটাও মা'র দোষ– এসব শুনে মা তো রেগে যাবেই তারপরই শুরু হয়...।

তুই যা এখন, ওসব বাদ দে, ও নিয়ে তোর আর আমার ভাবলেও করার কিছু নেই। মা'র কথা শুনবি, ঠিকমতো পড়ালেখা করবি, তাহলে মা রাগ করবে না, মারবেও না, বকবেও না।

সুমেরা : আপু মা রেগে গেলে, মাকে দেখলে আমার খুব ভয় হয়।

সায়রা : ওসব কথা থাক, এখন নিজের কাজ কর গিয়ে।

সুমেরা : আপু তুমি বিকেলের নাস্তা খাবে না?

তুই খেয়েছিস?

সুমেরা : না খাইনি, চল খেয়ে নেই, না খেলে মা যদি বকে। চল আপু চল।

সায়রা : চুপ কর, অত ভাবছিস কেন? মা আমাদেরকে অবশ্যই ডাকবে নাস্তা খেতে। বাবা অফিস থেকে ফেরেনি, বাবা ফিরলে একসাথে সবাইকে নাস্তা খেতে ডাকবে।

মিসেস রমিজা হনহন করে ঘরে ঢুকে ওদের দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে বললেন, সায়রা-সুমেরা তোমরা কী করছ? যাও ডাইনিং টেবিলে নাস্তা দিয়েছে, খেয়ে নিয়ে পড়তে বস। আগামীকাল স্কুল আছে, হোমওয়ার্ক সেরেছ? তাড়াতাড়ি যাও স্কুলের কাজ সেরে ফেল।

সুমেরা চুপিচুপি সায়রার কাছে গিয়ে বলে, চল আপু নাস্তার টেবিলে, মা'র মুড কিন্তু ভালো নেই।

সায়রা উঠে সুমেরার হাত ধরে বলল, হ্যাঁ চল। মার দিকে তাকিয়ে মাকে বলল, বাবা আজ আমাদের সাথে নাস্তা খাবে না?

মা বললেন, তোমাদের বাবা এখনও ফেরেনি। বাবা এলে আমি আর বাবা এক সাথে খেয়ে নেব। তোমরা খেয়ে নিয়ে পড়তে বস ।

বিকালের নাস্তা খেয়ে সায়রা-সুমেরা দুজনে সুড়সুড় করে পড়ার টেবিলে গিয়ে বই খুলে পড়তে শুরু করেছে। রমিজাও কিছু না বলে রান্নাঘরের দিকে গেলেন রান্নার কাজ সেরে বাচ্চাদের পড়ালেখা, হোমওয়ার্ক চেক করতে হবে। তারপর বাচ্চাদের খাইয়ে ওদের ঘুমুতে পাঠিয়ে আগামীকালের জন্য বাচ্চাদের স্কুলের টিফিন, অফিসের টিফিন, লাঞ্চ প্যাক, সকালের নাস্তা রাতেই রেডি করে রাখতে হবে। সারাদিন ক্লান্তিহীন এভাবে চলতে চলতে রমিজার শরীর ও মন মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠে, সাথে মেজাজটাও। এখন তো সেই আগের মতো বিশ্বস্ত এবং সার্বক্ষণিক কাজের লোকও পাওয়া যায় না। আমাদের দেশের পুরুষ মানুষরা বাসার কাজে সাহায্য করাকে মেয়েলি কাজ মনে করে এখনও। আজ স্কুলে টিচার্স কমনরুমে এ প্রসঙ্গে অফিসের কলিগ শিরিন আপা কথায় কথায় বলছিলেন, বহুকাল ধরে আমাদের পুরুষদের ভেতর একটা ইগো কাজ করে। চেহারা আর শক্তিতে দরাজ কণ্ঠস্বরের জন্য সমাজে তারা মানুষ হয়ে পরিচিত শক্ত প্লাটফর্ম বানিয়েছে, শক্ত সামাজিক প্রথার নিয়মে। ভেবে দেখবে না কেউ– মান আর হুস ছাড়া কি মানুষ হয়? আর এ কারণে সেই সব

মানুষদের সংসারে, নারীকে মাতৃত্বের দায়ে সন্তানের প্রতি মমতার বাঁধনে অমানবিক নিয়তির শিকার হয়ে একরকম বাধ্যমনের তাগিদে সংসারের সমস্ত দায় কাঁধে নিয়ে প্রান্তিক শক্তি প্রয়োগ করে নিজেকে ও সংসারকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। অবমূল্যায়নের মধ্যেও টিকে থাকার নীরব যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছে কত নারীকে। ধৈর্যচ্যুত হয়ে অনেক নারীর সংসারও ভেঙ্গে যাচ্ছে, নির্যাতন ও খুনের শিকার হচ্ছে নারী এবং শিশু। কত নারী আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে। কখনো কষ্ট সইতে না পারার আত্মগ্লানির অত্যধিক চাপে মাথা ঠিক রাখতে পারছে না। সামাজিক কুসংস্কার প্রথার দায়বদ্ধতায় কিছু বলতেও পারছে না শিশুদের সামনে, বাসার পরিবেশ নষ্ট হবে। কখনো উপায়ন্তর না পেয়ে সন্তানের উপরই নিজের ক্ষোভের আগুন ঝরাচ্ছে। এছাড়াও সন্তান-সম্ভবা মায়ের প্রসবউত্তর, প্রসবকালীন ও প্রসবপরবর্তী সময়ে অথবা ক্লিনিক্যাল কিছু সাময়িক সমস্যার কারণে নারীর মানসিক-শারীরিক অস্বাভাবিকতার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও এমন ক্ষেত্রেও অস্বাভাবিক আচরণকে বড়ো করে দেখা হয় সামাজিক পরিবেশে অনেক পরিবারে, কখনো অজ্ঞতার কারণে। এরকম সময়ে অসহায় নারীর ভেতরের রক্তক্ষরণের বিষয়টি সমাজের কেউ ভাবতে নারাজ।

সংসারের সমস্ত দায় সামলাতে গিয়ে স্বামীর কৈফিয়তের জ্বালাতনে সন্তানকে অতিরিক্ত পড়ার চাপ দিয়ে ফেলে মা। চাপে পড়ে লেখাপড়ায় বেসামাল সন্তান কখনও বাবার উদাসীনতার সুযোগে, মায়ের অতিশাসনে চোখের আড়ালে নানা রকম মাদকাশক্তিতে আসক্ত হওয়ার ঘটনাও ঘটছে। বাবা-মায়ের আদর-স্নেহ-মমতার বদলে শাসন দেখতে দেখতে ভালো রেজাল্টের চাপ, মেধার সংকুলানের অভাবে ভালো রেজাল্ট করতে না পারার হতাশায় অনেক সন্তান বখে যাচ্ছে। এভাবে বখাটে হওয়ার সুযোগ প্রসারিত হচ্ছে পরতে পরতে। চূড়ান্ত পর্যায়ে ঐশির মতো ঘটনাও ঘটে যাচ্ছে বৈকি! পরিস্থিতির টানাপড়েনে বুকের ধন স্নেহের সন্তান বখে যাবে, সন্তানের ভবিষ্যৎ কী হবে– এ ভাবনাগুলো সুস্থিরভাবে ভাবতে না পেরে মায়ের মন-মেজাজ আরো তুঙ্গে হলেও মুখ বুজে বোবা হয়ে থাকতে হয়। ভালোবাসার সন্তানদের বিকৃত চিত্র তাকে অস্থির করে তোলে। সমাজ-সংসারে চারদিকের চাপে মমতাময়ী মা তখন ঠিক থাকতে পারেন না। সংসারে ঘটে যায় অনেক নিষ্ঠুর অনাকাঙ্খিত ঘটনা। নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় রমণী! সমাজ থেকে, পরিবার থেকে, স্বামীর পক্ষ থেকে তাকেই শুনতে হয় ধিক্কার!

রান্নাঘরের কাজ সারতে সারতে রমিজা মনের মধ্যে শিরিন আপা ও তার কলিগদের কথাগুলো নিজের সাথে মিলিয়ে ভাবনার অতল গভীরে ডুবে আছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে ডোর বেলটা বেজে উঠল।

ঠকঠক জুতার শব্দে রমিজা বুঝতে পারলেন ফিরোজ সাহেব ফিরেছেন। সুমেরা দরজা খুলে দিয়েছে। রমিজার মোটামুটি আগামীকাল সকালের কাজ রেডি। সুমেরা মা'র কাছে এসে দাঁড়ালো। মা জিজ্ঞেস করলেন, কী মাগো, বাবা এসেছে? তুমি এখনও জেগে আছ? সুমেরা মাথা নিচু করে বলল, একটা অংক পারছি না।

রমিজা: ও তাই নিয়ে এতক্ষণ রাত জেগে বসে আছ, বলনি কেন? যাও খাতাটা ডাইনিং টেবিলে নিয়ে এস। বাবাকে খেতে দিব, সেই সাথে তোমার হোমওয়ার্ক দেখব। সুমেরা চলে গেল, রমিজা উচ্চস্বরে বললেন, বাবাকে খাবার টেবিলে আসতে বলো সুমেরা।

ফিরোজ সাহেব বেসিনে হাত ধুয়ে সাজানো ডাইনিং টেবিলের চেয়ার টেনে বসলেন। রমিজা প্লেট এগিয়ে খাবার তুলে দিলেন। খাবার নাড়াচাড়া করতে করতে ফিরোজ সাহেব রমিজার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– বাচ্চারা সবাই খেয়েছে? সুমেরাকে হোমওয়ার্ক-এর খাতা নিয়ে মা'র কাছে আসতে দেখে বললেন, তুমি এখনো ঘুমাওনি?

রমিজাই উত্তরটা দিয়ে বললেন, ওর একটা অংক হয়নি, তাই মা'র কাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

ফিরোজ সাহেব: বিপুল কোথায়, এখনও ফেরে নাই?

রমিজা : ওকে এখনো আমি দেখতে পাই নাই, ফিরেছে কী ফেরে নাই জানি না। আজ হঠাৎ বিপুলের খোঁজ করছ, নিয়মিত খোঁজ করলে অসময়ে বাইরে আড্ডা দেওয়ার সুযোগ পেত না। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে আমি পড়ালেখার তাগিদ দেই, তাতে সে খুব বিরক্ত হয়। বাইরের খবর নিতে তো আমি পারি না। রমিজা সুমেরাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন, তোমার অংকটা দেখি– সুমেরার অংক বুঝিয়ে দিয়ে ঘুমুতে যেতে বলে দিলেন।

ফিরোজ সাহেব : একটু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, ছেলে-মেয়েদের খোঁজ রাখতে পারো না, তো করটা কী? আগে তো পারতে এখন পারো না কেন?

রমিজা : আগে ছোটো ছিল, আমিই দেখেছি, এখন বড়ো হয়েছে। কখন কী করছে, কোথায় যাচ্ছে, আমার পক্ষে দেখা কী সম্ভব? রমিজা পরিবেশ খারাপ করতে চান না আর চেচাঁমেচি করে দেখেছে লাভ হয়নি বরং খড়্গ উঠেছে তারই উপর। তাই শান্ত কণ্ঠেই বলে গেলেন কথাগুলো। সারাদিনের ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীরে কথা বলারই ইচ্ছে করছে না মোটেও।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে রমিজা সচকিত হলেন। ফিরোজ সাহেব কে কে ওখানে বলে চিৎকার করে উঠে গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। মনে হলো কেউ বিপুলের ঘরের দিকে ধীর পায়ে ঢুকে গেল। ফিরোজ সাহেবের বুঝতে বাকি রইল না। রমিজার কাছে গিয়ে বললেন, তোমার গুণধর সন্তান ঘরে ফিরল।

রমিজা: হ্যাঁ, আমার গুণধর সন্তানই তো, তোমার কেউ নয়?

ফিরোজ সাহেব: প্রাইভেট কলেজে এতগুলো টাকা খরচ করে ভর্তি করেছি, কী পড়ালেখা করছে? এত রাতে কোথায় কী করে বাসায় ফিরছে আমাকে তো কিচ্ছু বলনি?

রমিজা: এসব বিষয়ে তোমাকে বলার সময় কোথায়? তুমি তো সবসময় তোমার রুটিনে চলো, বাকি সব আমার দায়। তোমারও তো দেখার দায়িত্ব রয়েছে। কথা বলতে গেলে বাসায় এমন অশান্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে ছাড় – বাড়ি ছেড়ে নির্জনে দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

ফিরোজ সাহেব: ও বুঝেছি। সারাদিন অফিস শেষে আমার একটু বিনোদন তোমার সহ্য হয় না। ঘর-সংসার, ছেলে-মেয়েদের দেখা-শোনার দায়িত্ব তো মায়েরই। কতবার বলেছি কষ্ট হলে চাকরিটা ছেড়ে দাও।

রমিজা ধীর কণ্ঠেই বললেন, আমি চাকরি ছেড়ে দিলে এ সংসারের খরচ তুমি একাই সামলে নিতে পারবে? তাহলে কালই চাকরি ছেড়ে দেব।

ফিরোজ সাহেব একটু অবাক হয়ে রমিজার দিকে তাকিয়ে ভাবছেন, যে কি-না রুক্ষ মেজাজি, আজ এত ঠান্ডা সুরে কথা বলছে বিষয়টা কী?

রমিজা সমস্ত কাজ গুছিয়ে নিয়েছে আজকের মতো। তাই নিশ্চিন্তে ঘুমুতে যাবার প্রস্তুতি। বর্তমানে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিপুলের বিষয়টা, তাই এখন ভাবতে চাইছেন না।

ফিরোজ সাহেব বিপুলের বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বিছানায় শুয়ে নানান চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির চিত্র তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। রমিজা সব কাজ সেরে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে নিমেষেই দুচোখে গভীর ঘুম নেমে আসে।

লেখক : সাহিত্যিক ও গল্পকার

ধারাবাহিক
উপন্যাস-৮

ভ্রষ্ট বিলাস

সাগরিকা নাসরিন

বউটা শেষ পর্যন্ত বাঁচেনি। চিররুগ্না। জীবনে সুস্থ থাকা ছিল সুদূর পরাহত। মরার সাধ তার কম ছিল না। মৃত্যু জীবনের চেয়ে যখন কম বেদনার তখন মৃত্যু কে না চায়। মরে বউটা বেঁচে গেল।

শোকের বয়স সাড়ে তিনদিন। গরিবের শোক আরো ক্ষণস্থায়ী। হাওয়াই মিঠাই। মুখে পুরতে পুরতে নাই।

সন্তানদের নানাবাড়িতে রেখে সুলেমানকে ফিরতে হলো যথারীতি। কিন্তু মাসের এক তারিখের আগে সে কাজে যোগ দিতে পারল না।

জয়নব বলল, ভালোই হইছে মামা। এই কয়দিন ব্যবসায় একটু হাত লাগান।

নেপথ্যের সাহায্যে সমস্যা ছিল না। পারুলের পাশে সুলেমানকে দেখা–পাড়ার লোকদের মাথা ব্যথার মহা কারণ হয়ে দাঁড়াল। বকুলকে নিয়ে কথা উঠলে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু সেটাতে গল্প জমল না। পাড়ার লোকজন মজা পেল না। মেয়ের মায়ের প্রেম যেভাবে জমিয়ে রাখল তাদের, বকুলের দিকে তারা ফিরে তাকানোর সময়ই পেল না। সুলেমান আলাদা মেসে চলে যেতে বাধ্য হলো। জয়নব বাধা দিয়েছিল। শেষে পারুলের অটল সিদ্ধান্তের কাছে পরাজিত হয়ে বলেছিল, আমাগো ব্যবসা ভালো চললে মাইনষের কী সমস্যা মা? মানুষ এত খারাপ কেন?

পারুল নিশ্চুপ। ব্যবসার চেয়ে বড়ো ক্ষতি অন্য জায়গায়। মনাইয়ের বেপরোয়া আচরণ। দুশ্চিন্তা হিমালয়ের মতো ভর করে আছে পারুলের মাথায়।

জয়নব বলল, আমি মামারে ফিরাইয়া আনব। সে খুব ভালো মানুষ।

নিরুপায় পারুল বলল, যতই ভালো মানুষ হউক, সে তোমার আপন মামা না। তার জন্য এত দরদ কইরা লাভ নাই।

– আপন-পর দিয়া সম্পর্ক হয় মা? তাইলে তো আমার বাপ আমারে ফালাইয়া যাইত না। আমার বিপদে সুলেমান মামা আমার জন্য কী করছে, তুমি জান না? মনাইয়ের মতো জানোয়াররে সে কীভাবে দমাইয়া রাখছে।

– আমি সব বুঝি মা। তবুও নিরুপায়। সমাজের কাছে হাত-পাও বান্ধা।

– সমাজের কথা কও মা? সমাজ তোমারে খাইতে দেয়, না পরতে দেয়? না খাইয়া থাকলে সমাজ তোমারে খাওন দিয়া যায়?

জয়নবকে বোঝানো বকুল-পারুলের কাজ না। বাপটা চলে যাওয়ার পরে মেয়েটা বয়সের চেয়ে এগিয়ে গেছে। সমস্যা মানুষকে শক্তিশালী করে। জয়নবকে যুক্তিতে পরাস্ত করা সহজ কাজ না।

সন্ধ্যায় মেসে ফিরে রান্না করছিল সুলেমান। জয়নব গিয়ে হাজির। কৌতূহল অপ্রস্তুত করে তোলে সুলেমানকে। জয়নবের মাথায় কখন যে হাত চলে গেছে টের পায়নি সুলেমান।

– মা... সন্ধ্যার পরে বাইরে বাইর হইছ একলা? বাসায় বইলা আস নাই। কাজটা কি ভালো হইছে?

– আমি আরো একটা খারাপ কাজ কইরা আসছি মামা।

বিপজ্জনক কিছু করার পর মানুষ নির্বিকার থাকে না। জয়নব ভীষণ রকম স্বাভাবিক। দুচোখ স্থির।

– মামা, সন্ধ্যার পরে মা নামাজ পড়তেছিল। আমি ভ্যান বাইর করছিলাম। ব্যবসা ছাড়া সংসার চলবে কীভাবে। মনাই আইসা

অনেক বাজে কথা বলা শুরু করল। কী বলছে শুনবেন?

– না। দরকার নাই। ওরা কী পারে আমি জানি।

– তারপরও আপনের শুনতে হবে। মনাই আমার বাপ তুইলা কথা বলছে। যার বাপ খারাপ মাইয়া মানুষ নিয়া সংসার করে, তার এত দেমাগ কিসের। এত খারাপ বাপের মাইয়ারে কে বিয়া করব। ও সীমা ছাড়া আমারে উত্তক্ত করছে। শেষে আমি ওর গালে একটা লম্বা থাপ্পর মাইরা চইলা আসছি।

– ভালো করছ মা। অগোরে দু-চাইরটা চড়-থাপ্পর না দিলে সিধা অয় না।

– আমি আর বাসায় ফিরা যাইতে পারব না মামা। মনাই আমারে খাইয়া ফালাইব।

– তাইলে এখন কোথায় যাইবা মা?

– জানি না।

জানা-শোনার পরিধিটা সুলেমানের এতই ছোটো যে হঠাৎ সে কোনো কুল-কিনারা পেল না। জয়নব বলল, মামা থাপ্পরটা দেওয়ার পর আমার কী মনে হইছে, জানেন? মনে হইছে, আমি পারি। অনেক কিছুই করতে পারি। যদি দরকার হয় আমার বাপেরে আমি কাইটা দুইভাগ কইরা ফালাইতে পারব।

– এইডা কী কও মা?

– মামা বিশ্বাস করেন, আমার বাপেরে খুন করতে মন চায়। এইডা একটা বাপ! যে মাইয়া মানুষ ছাড়া কিচ্ছু বুজে না। নিজের মাইয়ারও পাঁচ পয়সা দাম দেয় না, মাইয়া মানুষ পাইলে... ভালো-মন্দ সব ভুইলা যায়।

কথা বলতে বলতে কখন যে শুয়ো পোকার মতো কষ্ট বুকের মধ্যে দাপাদাপি করতে শুরু করেছে টের পায়নি জয়নব। অজান্তেই চোখ বেয়ে নেমে এসেছে নোনা জল।

– কাঁদতেছ কেন মা?

– মামা আমার মায় কয়, আল্লাহ সবই করতে পারেন... একটা জিনিসই খালি করতে পারেন না।

– কী করতে পারে না মা?

– আল্লাহ কারো প্রতি অবিচার করতে পারেন না। মামা... আমার বাপ আমাগো উপরে যে অবিচার করছে, আপনি কি মনে করেন আল্লাহ অবিবেচক? তার বিচার হবে না?

– বিচার তো অবশ্যই হইবো মা।

– আপনে বাঁইচা থাকলে দেখতে পাবেন। কী ভয়ংকর বিচার!

– থাক মা, তুমি তারে অভিশাপ দিও না।

– অভিশাপ দেওয়া লাগে না মামা। অভিশাপ আপনা আপনি আইসা পরে।

– আমি তোমার কষ্ট বুজি মা। তয় তুমি এখন যে কাজ কইরা আসছ, এর সমাধানতো কিছু খুঁইজা পাইতেছি না।

– আপনে চিন্তা কইরেন না মামা। আপনে খালি আমার সাথে চলেন।

সুলেমানকে নিয়ে নিজের পাড়ায় ফিরে এল জয়নব। কিন্তু বাসায় ফিরতে পারল না। বাসা বরাবর গলির মুখে মনাই দাঁড়িয়ে। মনাইয়ের গায়ে যে আগুন সে ধরিয়ে দিয়েছে, তার জ্বলন এত অল্পে শেষ হবার নয়।

সাজিদকে ডেকে আনা হলো। জয়নবের বিশ্বাস, একবার মালার কাছে পৌঁছাতে পারলে, মালা তাকে আশ্রয় না দিয়ে পারবে না। কিন্তু ভাগ্য বিমুখ। সাজিদকে যদিও মিলল, মালাকে মিলল না। সে হাসপাতালে। শেকাবুর সাহেবের অপারেশন মাত্র হয়েছে। বাসায় ফিরতে আরো দু-চারদিন লাগবে। বোরকা পরিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো জয়নবকে। মালা সব শুনে সুলেমানকে বলল, আপনে শুধু ওর মা-খালারে খবর দেন, ও নিরাপদে আমার কাছে আছে। আর মনাইয়ের গতিবিধি আমারে জানাবেন।

নির্ভয়ে চলে গেল সুলেমান। মালা জিজ্ঞেস করল, উনি তোমার কী হন?

– আমার মায়ের দূর সম্পর্কের ভাই। খুব ভালো মানুষ। আমার মায় কয়, উনারে না দেখলে জানতামই না, দুনিয়াতে কোনো ভালো পুরুষ মানুষ আছে।

– উনি কি তোমাদের সাথে থাকে?

– না। আগে ছিল। কিন্তু মানুষে নানা কথা বলে। ওনার বউ মারা যাবার পরে, আমার মায়রে জড়াইয়া অনেক কথা উঠছিল। পরে উনি আলাদা মেসে চইলা গেছে।

– ওনার আলাদা থাকার দরকার কী? তোমারওতো বাপ নাই। উনিও ভালো মানুষ। তোমরাতো এক সাথেই থাকতে পারো।

– এইডা কী কন?

– মালা শোন, এইডা আমি বুঝি, বিষয়ডা তোমার জন্য অনেক কষ্টের। তবুও কই, তোমাগো তো একটা গার্জিয়ান দরকার। নাকি দরকার নাই?

– দরকার।

– তাইলে সমস্যা কী। দেখ, তোমার বাপ জীবনে তোমার মায়রে শান্তি দেয় নাই। একটা চরিত্রহীন মানুষ। সারাজীবন তোমার মা কষ্ট পাইছে। তার জীবনে যদি একজন ভালো মানুষ আসে, সমস্যা কী? তুমি চাওনা তোমার মা একটু শান্তিতে থাকুক।

মাথার ভেতরে চড়কির মতো ঘুরপাক শুরু হয়েছে। অবাক চোখে মালার দিকে তাকাল জয়নব।

– আমি জানি, বাপ-মার বিয়াশাদি কোনো সন্তান মানতে পারে না। এখনই তোমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার নাই। ভাবো। সময় নেও। জয়া..!

– আমারে ডাকলেন?

– হুঁ। তোমারে ডাকলাম। জয়নব নামটা অনেক বড়ো। ছোটো করে ফালাইলাম। তোমার আপত্তি আছে?

– আপত্তি কী কন? জয়া নামটা অনেক সুন্দর।

– আইজকে থাইকা আমি তোমার নাম দিলাম জয়া। তুমি মনাইয়রে সাহস কইরা থাপ্পর মাইরা কী প্রমাণ করছ জান? তুমি বিশ্ব জয় করতে পার।

– কী যে কন?

– বখাটে হইল কেউটে সাপ। ওগোর গায়ে হাত তোলা বিশাল ব্যাপার। তোমারে পুরস্কার দেওয়া উচিত। আমি তো দিলাম একটা নাম।

– আমার কাছে এইডাই অনেক বড়ো।

জয়নবের মন খারাপ ভাবটা কেটে গেল। মালার অনেক শক্তি। কোনো কোনো মানুষের সাথে কথা বললেই মন ভালো হয়ে যায়। মালা তেমন মেয়ে, অনেক প্রাণশক্তি নিয়ে যার জন্ম।

এত বড়ো হাসপাতাল। বাইরে থেকে দেখেছে জয়নব। ভিতরে যে

এর এত সৌন্দর্য ভাবতেও পারেনি। নিজেকে খুব হালকা লাগছে। মনের মধ্যে বসে থাকা ভয় নামক দৈত্যটা হঠাৎ যেন পালিয়ে গেছে।

ক্যান্টিন থেকে ফেরার পথে ডাক্তার মুশফিকের সামনে পড়ে গেল মালা। সকালে দুবার কেবিনে দেখা হয়েছিল। কথা বলার সুযোগ হয়নি। রাতে অনেকবার ফোন করেছিল মুশফিক। মালা কেন তার ফোন ধরেনি, সে কৈফিয়ত না নেওয়া পর্যন্ত মুশফিক তাকে ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।

অনুমান করার অসীম ক্ষমতা মালার। ছোটোবেলা থেকেই কেন যেন তার মনে হতো, কোনো এক বৃদ্ধের সাথে তার বিয়ে হবে। শেকাবুর সাহেবকে দেখামাত্রই সে আঁচ করতে পেরেছিল, এই ভদ্রলোকই তার স্বামী। গতরাতে মুশফিকের ফোন পেয়ে তার মনে হয়েছিল, এই ভদ্রলোক তাকে ভোগাবে। অনেক দূর নিয়ে যাবে।

মুশফিক বলল, আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। পেশেন্ট দেখে এলাম। কেবিনে আপনাকে না পেয়ে...।

– ক্যান্টিনে গেছিলাম।

– তা তো দেখতেই পাচ্ছি। ফোন দিলাম। রিসিভ করলেন না যে?

– ক্যান্টিনের শব্দে ট্যার পাই নাই।

– কাল রাতেও তো ফোন করেছিলাম।

– ঘুমাইয়া পরছিলাম।

– আপনার অজুহাতের শেষ নাই। আপনার সাথে আমার কথা আছে।

– কী কথা? বলেন।

– না মানে...।

জয়নবকে সামনে গিয়ে অপেক্ষা করার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে মালা বলল, এইবার বলেন।

– আমি রাশেদ সাহেবের রিকোয়েস্টে আপনাকে প্রথম কল করি। আপনি রিসিভ করেননি। কল ব্যাকও করেননি। কাল রাতেও কল দিলাম। আপনি নাকি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এখন আবার ক্যান্টিনের অজুহাত দিলেন। আমি খুবই অবাক হয়েছি। আমি এ জীবনে দেখি নাই, কেউ আমার ফোন রিগ্রেট করেছে। বিষয়টা কী বলুন তো?

– আপনি কত সম্মানিত মানুষ! আপনার সম্মান কি আমরা দিতে পারি?

– আমি এসব শুনতে চাইনি।

– তাইলে কী শুনতে চাইছেন?

– মানে...?

– না মানে... আমি খুবই দুঃখিত। ফোন না ধরা ঠিক হয় নাই। খুবই খারাপ কাজ হইছে।

– এসব বাদ দিন। আপনি আমাকে বলুন, কেন আপনি এমন করছেন। আমি কি খারাপ কিছু করেছি?

– ছি... আপনি কী বলতেছেন? আসলে আমি ফোনের ব্যাপারে খুবই মূর্খ একজন মানুষ।

– শোনেন এই যুগে গ্রামের অশিক্ষিত গণ্ড মূর্খ মেয়েরাও ফেসবুক চালায়। আপনার ফোনে আগ্রহ নেই, ঠিক আছে। কিন্তু ডাক্তারের ফোন রিসিভ না করার তো কোনো কারণ দেখি না। আমি তো পেশেন্টের প্রয়োজনেই ফোন করেছি।

– রোগীর প্রয়োজনে মানুষ এতবার ফোন করে!

তৈরি ছিল না মালা। ঘটনার আকস্মিকতায় কীভাবে যে মুখ অভ্যন্তরীণ কোন গোলযোগ হলো, বুঝতে পারল না সে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পরক্ষণেই সে বলল, আমি আসলে বলতে চাইছিলাম... আপনি কত ভালো মানুষ! এতবার রোগীর খোঁজ নিতেছেন। আমার খুবই অপরাধ হইছে, ফোনটা না ধইরা। আসলে মোবাইলটা দূরে ছিল তো। আমি খুবই দুঃখিত।

ব্যস্ততা ভাববার অবসর দেয়নি মুশফিককে। আসলেই তো সে এতগুলো কল না করলেই পারত। বাধা পেলে স্রোতের গতি বাড়ে বহুগুণে। মালার বেখেয়ালিপনা মুশফিকের ভিতরের জিদটাকে কখন যে উস্কে দিয়েছে, সে নিজেও বুঝতে পারেনি। বলার মতো ভাষা পেল না মুশফিক। মালাই বলে চলল, আমি খুবই দুঃখিত। আপনে আমারে ক্ষমা কইরা দিবেন আশা করি।

– তাহলে শুনুন, আজ আপনি আমাকে ফোন করবেন। আমি কিন্তু আর আপনাকে ফোন করব না।

এমন শক্ত কথায় কে না অবাক হয়। অবাক না হয়ে পারল না মালা। হালকা আঘাতও লাগল মনে হয় মনে। সূক্ষ্ম সুচের মতো একটা তীর।

মুশফিক বলল, আপনার দায়িত্ব আমাকে রোগীর কন্ডিশন জানানো।

– আপনে এখন কেমন দেখলেন?

– হালকা জ্বর আছে। এটা তেমন কিছু না। রাতে যদি জ্বরটা বাড়ে জানাবেন।

– জ্বর না বাড়লে তো জানানোর দরকার নাই?

– কেন ফোন দিতে খুব সমস্যা আপনার? আমি যে এতবার ফোন দিলাম, তার ক্ষতিপূরণ হবে না? আজ আপনি আমাকে ফোন দিবেন। আপনার ফোনের অপেক্ষায় থাকব।

মালার ভীষণ খারাপ লাগতে শুরু করেছে। হাত-পা কাঁপছে। চোখে পানি এসে যাচ্ছে। কাঁদো কাঁদো গলায় সে বলল, অবশ্যই আপনারে ফোন দেব। আমার স্বামীর ভালোর জন্য...।

কথা শেষ করতে পারল না মালা। মুশফিক জিজ্ঞেস করল, শেকাবুর সাহেব আপনার স্বামী?

– কেন? আপনি জানেন না?

আর একটা কথাও বলল না মুশফিক। বিদায় নিয়ে চলে গেল নীরবে।

রাতে সত্যিই ফোন করল মালা। ডাক্তার মুশফিককে পাওয়া গেল না। সে ফোন ধরল না। *চলবে...*

হৃদয়ঘটিত কাব্য

জাফরুল আহসান

হৃদয় আমার উলটে পালটে দেখছ কি!
প্রেমভিখারির আত্মদহন নয় তো সেকি
হৃদয় তোমার যুগলবন্দি বাঁধল রাখি
অর্ধেক চুমু স্বাদটুকু তাই আগলে রাখি।
অলস দিনের ঝড়োহাওয়ায় পালটে গেলে
ফুলের কাঁটায় কাছড়ে হৃদয় সব কি পেলে।
চোখের ভাষায় সব কথা হয় যায় না বলা
সুখ ও দুঃখের চার দেয়ালের কাব্যকলা।
তবুও তোমার একটি হৃদয় কাল সকালে
ভাঙল নদীর একূল ওকূল ছন্দ-তালে।

সে ভাষা পড়তে পারিনি

সোহরাব পাশা

তোমাকে অর্ধেক ভাষা লিখি
অন্য অংশে ঝুলে থাকে আরণ্যক মৌমাছির হুল
দুর্বোধ্য আঁধার উদ্ভিদের ছায়ায় ধূসর ইঁদুরের গাঢ়
নিশ্বাসে ভেজা লাল ফিতে, নাকফুলে শিশিরের
নীল ঘ্রাণ এবং অর্ধেক মৃত স্বপ্ন,
যেটুকু আলোয় আছে তার ভেতরেও
অবাধে ঢুকে পড়ে ভুল ছায়া পিঁপড়ে কাহিনি ;
দুপুরের রোদে পুড়ে ঘামছিলে খুব
কোথাও খসে পড়া স্বপ্নটা তখন খুঁজছি নির্জন পথে।
তীব্র বিষাদের ধুলো উড়াউড়ি হৃদপিণ্ডে–
ঝুঁকে পড়ে আকাশ দেখছি। না, একটিও পাখি নেই
উত্তরের হলুদ বাড়িটা সন্ধ্যের জানালা খুলে
ডেকে ওঠে, আমি তার ভাষা বুঝতে পারিনি, চোখ ভিজে যায়
অজস্র খুলির গাঢ় শব্দ দীর্ঘশ্বাস ভাঙা শব্দ–
সব পথ ভুলে যাই, মৃত ঘাসের ভেতর খুঁজি
ভুলে যাওয়া উজ্জ্বল মুখ তার মৌন বিষণ্ন শব্দ
চোখের ভেতর গোল হয়ে বসা অমিতাভ জ্যোৎস্না।

সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

আমিরুল হক

স্বপ্ন ও সম্ভাবনা একই সূতোয় গাঁথা
যেন এক প্রাণ এক আত্মা।
আর নয় স্বপ্ন, নয় কোনো কল্পনা
চলমান প্রক্রিয়ায় বাস্তবতা দৃশ্যমান।
দুঃস্বপ্নের বেড়াজাল টপকিয়ে
উন্নয়ন অগ্রযাত্রার চাকা অবিরাম
ঘুরছে তো ঘুরছে।
সুযোগ্য উত্তরসূরির সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের
ফলশ্রুতিতে বিপুল সমারোহে
এগিয়ে চলছে এক দারুণ মহা কর্মযজ্ঞ।
সক্ষমতার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে
দেশের বৃহত্তর কল্যাণে নির্মিত হচ্ছে
প্রমত্তা পদ্মার ওপর সেতু
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের একসময়
যা ছিল স্বপ্ন ,ছিল অসম্ভব
তাকে উড়িয়ে দিয়ে আজ তা বাস্তব।
আশা জাগানিয়া এই সেতু সত্যিসত্যিই
উন্মোচন করবে সাফল্য আর
সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত।
উন্নয়নের সূচকে ঘটাবে নীরব বিপ্লব
করবে যোগ এক নতুন মাত্রা।

নতুন বিশ্ব বিনির্মাণে

শাফিকুর রাহী

একাত্তর আর পঁচাত্তরের সব ঘাতকের বিচার হবে জাতির কাছে জবান দিলেন,
দেশের দুশমন সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদের সব আস্তানা গুঁড়িয়ে দেওয়ার শপথ দিলেন।
সেই থেকে যে বীর দাপটে অন্যায়েরই বিরুদ্ধে তিনি দুঃসাহসী অভিযানে,
অনিয়মের নিয়ম ভেঙে উদারনীতি গ্রহণ করেন জন্মভূমির বিজয় গানে।
আপনহারার কান্না ভুলে মাটি-মানুষ ভালোবেসে সকল বাধার আঁধার কেটে,
দেশ-বিদেশে মানবতার গান শোনালেন জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে যে!
বিশ্বব্যাপী জানান দিলেন সন্ত্রাসমুক্ত এক এশিয়া গড়ার প্রজ্ঞা শপথ পাঠে,
মানবমুক্তির আরাধনায় দিন বদলের সফলতার বইল হাওয়া হাটে-মাঠে।
শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কৃষি এবং ডিজিটালের স্বপ্ন সফল বাজনা বাজে সবার ঘরে;
অর্থনীতি, রাজনীতি আর সমাজনীতি সকল কর্মে জাগছে মানুষ অকাতরে।

শান্তিপূর্ণ সমাধানে আকাশ দাওয়ায় সুখের হাওয়ায় লাগল দোলা প্রাণে প্রাণে,
পিতার মহান আদর্শতে দেশরত্ন এদেশ গড়েন অসামান্য অবদানে।
দুঃশাসনের আঁধার ভেঙে সমহিমায় এগিয়ে চলেন উন্নয়নের গতিধারায়,
সৌহার্দ্য সম্প্রীতির আভায় বিশ্বশান্তির মডেল হবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায়।
থাকবে না আর দেশদ্রোহী গুপ্তঘাতক, জঙ্গি এবং সন্ত্রাসী সব পালিয়ে যাবে;
বিশ্বজয়ের সম্ভাবনায় জাগরণের অভিযানে দেশবাসী শান্তি পাবে।
আওয়াজ তোলেন দূষণমুক্ত জলবায়ুর মীমাংসাতে নতুন বিশ্ব বিনির্মাণে,
জাতিসংঘের সে ভাষণে বিশ্ববিবেক চমকে ওঠে অবিস্মরণীয় আহ্বানে।
তাঁরই সকল দুঃসাহসী কর্মকাণ্ডে অবাক বিশ্ব বীরগরিমায় জ্বলে ওঠে,
দেশ-বিদেশে তাঁর সে মহান তপস্যাতে আদর্শতে মানবমুক্তির গোলাপ ফোটে।

তাঁর সে দীর্ঘ দুখের বিলাপ রক্তাক্ত এই স্বদেশভূমির দীর্ঘশ্বাসে হৃদয় কাঁপে,
দুঃস্বপ্নেরই অন্ধকারে তাড়া করে প্রাণের সকল স্বজনহারার সে সন্তাপে।
মেঘলাকাশে ডানা মেলে সূর্যকন্যা জানান দিলেন গড়তে স্বদেশ সবাই জাগো,
সততা আর সাহস নিয়ে বলেন তিনি থাকতে সময় দুঃশাসনের আঁধার ভাগো,
তাঁর সে মেধায় প্রবল প্রজ্ঞায় জাগল মানুষ ঘরে ঘরে এগিয়ে চলেন বীরজননী,
দুঃসময়ে কাণ্ডারি সে স্বদেশবাসী তাঁর অবদান গর্বগাথায় সবাই ঋণী।
প্রাণের সকল আপনহারার শোকানলে আজো তিনি আবেগেরই শোকাশ্রুতে
বাকরুদ্ধ সে সাহসিকা এক সাগর রক্তে পাওয়া বিজয়ী জাতির ধমনিতে
দেশপ্রেমী মানবতার পরম বন্ধু ইতিহাস-ঐতিহ্য রক্ষায় স্বদেশ গড়তে,
বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বীর সাহসী যুদ্ধে লড়তে।

দেশ-জনতার শেষ ঠিকানা মহীয়সী জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়নে
অগ্রসরমান বিশ্বনেতা দেশরত্নের দূরদৃষ্টি দারুণ প্রজ্ঞায় উন্নয়নে।
সারাবিশ্বে শান্তি সুখের রোল মডেল খ্যাতি অর্জন তাঁর সে মহৎ আদর্শতে
এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ আজ সুনাম ও সাফল্যের ধারায় দেশবাসীরা উঠল মেতে।

বৈশাখের পঙ্‌ক্তিমালা

নুরুল ইসলাম বাবুল

বৈশাখ কেড়ে নেয় নির্বিঘ্ন ঘুমের নূপুর
গাঁয়ের মেঠোপথ খেলে ধুলো উড়াউড়ি,
খরতাপে পুড়ে যায় বৈশাখি দুপুর
নদী চাই– বলে যায় প্রেমাস্পদ নারী।

নদীর মাহাত্ম্য নিয়ে চলে বিশ্লেষণ
বৈশাখি হাওয়া আনে দারুণ দহন
ফের নারী বলে যায়– আমার চাই নদী
আহা! নদী চলেছে সাগর অবধি।

অতঃপর টিকে যাওয়া জীবনের এই প্রেম
ঋতুচক্রে আবর্তিত এই খেলাঘর
বৈশাখ করে দেয় কিছু এলোমেলো
মৃদু হয় কোকিলের স্বর।

আয়েশি সময়

ফয়সাল শাহ

এই নিশিথে এত কথা কাহার সনে
দুমড়ে মুচড়ে জ্বলে যায় শিরা-উপশিরা
জ্বলে যায় অনুভবের সবটুকু অনুভূতি
কেন এমন করছ, যদি এমনই কর
তবে কেন সোহাগ প্রণয়ডোরে
কাছে নিলে?
জানি আমি, অনিচ্ছায় এমন করছ
আমায় কষ্ট দিতে চাওনি
অজান্তেই নিজের আনন্দ, নিজের
সুখানুভব উপভোগ করার জন্যই
একান্ত নিশিথে কথোপকথন
আয়েশি সময় ভাগাভাগি!
এখন হয়ত বোঝার স্থিরতা আসেনি
কোন ক্ষতির সান্নিধ্যে যাচ্ছ
একদিন ছাইচাপা আগুনে
উত্তাপে তোমাকেও ভস্ম হতে হবে
সময় থাকতে নিয়ন্ত্রণে রেখে
হৃদয়ের প্রেমের অর্ঘ্য
স্থির করো কোন হৃদয়
বেদিতেই অর্পণ করবে।

আজি বসন্ত সবার মনে

ম. মীজানুর রহমান

অনন্ত আলোর গানে অন্তহীন অমা রজনির তমিস্রারও হয় যে অবসান;
প্রবল শৈত্যের আবর্তনীয় আবহে উৎফুল্ল পাতা ঝরা গাছেরও গায়ে
প্রকৃতির আপন স্বভাবে আনন্দে বিভাস্বিত নব কিশলয় যায় গজায়ে।
তখন থাকি না কেউ আর মুখ ভারাক্রান্ত করে, গাই শুধু বসন্তের গান।

প্রতি বসন্তে জাগে ফুলের বাসর, জাগাতে আসে আনন্দ সবার মনে,
অমোঘ প্রেম-উন্মাদনায় প্রকৃতি যেন ঢেলে দেয় আপন ফুলের ডালি;
তারুণ্যে আসে শুভাশিসের জোয়ার, বাধভাঙা নদীর মতো ক্ষণে ক্ষণে,
প্রেয়সী খোঁপাখোলা এলোকেশে হেসে হেসে নেচে যায় হৃদয় ঢালি।

প্রকৃতি তার দক্ষিণের দুয়ার খুলে প্রেম দেয় মৃদু মলয়ের নন্দিত তপস্যায়;
আমরা ভাবি, হে মহাপ্রাণ , তুমি কোথায় থাকো এত ভালোবাসা দিতে ,
বসন্তের কালিক ভ্রমর উদ্বেলিত মত্ততায় ফুলে ফুলে উড়ে উড়ে আসে যায়,
বাতাসের গানে গানে আনন্দে নেচে ওঠে প্রাণ আমাদের হৃদি-আঙ্গিনাতে!

আজি বসন্ত সবার মনে ফুটে উঠুক ফুলের মতো, দুঃখ ভারাক্রান্ত ব্যথা ঘুচে যাক।
নব প্রাণের উদ্যমে যৌবনের উদ্দাম আলোর আশায় অতীতের আঁধার মুছে যাক।

রাতজাগা প্রহর

জাকির হোসেন চৌধুরী

জীবন নদের প্রবাহধারায় জাগে কত আশা
জেগে ওঠে প্রাণ, বেজে ওঠে সুরের মূর্ছনা
ফুল ও ফলের শোভা পাখির গান আর হিমেল পরশ
হৃদয়ের মাঝে ক্ষণে ক্ষণে বয়ে যায় সুরের ঝংকার
আকাশে সূর্যচ্ছটা, চাঁদ জাগে রাতের প্রহরে
আলো আর আঁধারের এ খেলায় সুরের মূর্ছনা
প্রত্যাশারত প্রাপ্তিতে আছে শুধু আনন্দের ধারা
সে আনন্দে ধুয়ে যায় জীবনের সমস্ত ক্লেদ
সে আনন্দ ছুঁয়ে যাক সকলের ঘর্মাক্ত শরীর
মুছে যাক জীবনের সমস্ত ছেদ-বিচ্ছেদ।

জীবন বদলে যায় ভালোবাসার ছন্দে

নাহার আহমেদ

কাশের বনের ধার ঘেঁষে যে
ছোট্ট বুনো পথ,
ছিল সেদিন হৃদয় মেতে
থামল প্রথম সেই খানেতে
ভালোবাসার রথ।
লজ্জাবতী লাজুকলতা
হলাম যে সেই ক্ষণে,
হৃদয় আমার আকুল করে
আবেগ এসে জড়িয়ে ধরে
একান্তে নির্জনে।
প্রজাপতি মনটা নাচে
জলের নূপুর পরে,
ঝিরিঝিরি সুরের দোলায়
ঝর্ণাধারা ঐ বয়ে যায়।
আমায় পাগল করে।
ফাগুনের ঐ পালকি চড়ে
কৃষ্ণচূড়া আসে,
পরায় নতুন প্রেমের চোলি
আনন্দে আজ খেলব হোলি
শাপলা দিঘির পাশে।
কে বলে প্রেম সর্বনাশী
মিথ্যে স্বপ্ন দেখায়,
ছন্দ তোলে হৃদয় বনে
আসে যদি মধুর ক্ষণে
জীবন বদলে যায়।
প্রেমের ঘরে লাগিয়ে তালা
ভুল করো না আর,
ভালোবাসা ফিরে যাবে
তখন কি আর কাছে পাবে
মধুর পরশ তার।

অনুর্বর মৃত্তিকায়

নির্মল চক্রবর্তী

শতজনমের দুঃখ নিয়ে এভাবে পথ চলা
কতদিন জানি না।
উর্বর জমিনে আস্তর পড়ে গেছে
চোখের সামনে থেকে ভালোবাসার সব কিছু
স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে কখনো কখনো
মুষ্টিবদ্ধ হাত এগিয়ে যায় কোনো এক ছায়াতরুর কাছে
ছায়াতরু ঘৃণাভরে ফিরিয়ে দেয় ।
আবার অচেনা গন্তব্যের পথে পথে
দৃশ্যমান হয় পাহাড়ি জনপদ
তবুও নির্ভয়ে এগিয়ে যাই
দুঃস্বপ্নের চোরাগলিতে
কাউকে পাইনি পাবো না কোনোদিন
শুকিয়ে গেছে জীবনের সকল স্বপ্নসাধ
তবুও কেন বেঁচে আছি জানি না
তনুশ্রী, ডালিয়া, বুকে কঠিন প্রস্তর
বেঁধে এগুতে এগুতে বিদীর্ণ করে দাও
দেখবে সোনালি ফসল ফলবেই এ অনুর্বর মৃত্তিকায়।

মুখিয়ে ছিল বৃষ্টি

ফারিহা রেজা

মুখিয়ে ছিল বৃষ্টি
উত্তাপ ঝেড়ে ফেলে
বাড়াবাড়ি বেশ ছিল
আদতে এসব বর্ষণবিরোধী অপবাদ
কাদায় পানিতে সব একাকার সব বারে হয়
গরম ভাপ না যেতেই লোকমুখে এতকথা!
শুনবে নেপথ্য কাহিনি
গরম বর্ষায় না ভিজেই ধুম পিটুনি খেয়েছে।
বাড়তি তাপমাত্রার কী ফুটানি
খালি পিকআপ লয়
এত বেয়াদবি পঞ্চাশ বছর যাবৎ দেখেনি কেউ।
দেখলে না, গরম পড়ে তো তিনি আরো চটেন
তিনি সব সময় গরম
বৃষ্টিপাতের আগে গরম তাই গুম হয়ে যায়!
যেন মান বাঁচাতে নামতে হয় প্রকৃতিকে
সামনে পড়েছিল মৌসুমি নিতম্বিনী।
ক্ষেপে গিয়ে বলে, মেঘ গুড়গুড় এখনো থামো।
যাও শুয়ে পড়ো নিচে
অবিরত জলদি।
গা ভেজা কৃষক খোলা মাঠে কাজ সেরে উঠে দাঁড়ায়
এই মুহূর্তে কর্ষণযোগ্য শস্যের হিসাব বাদ।
শায়িত মেঘের সাথে গড়াগড়ি খায়
মায়ের উঠান পালানো বালক
আষাঢ়ের ঢলে ডুবে যাওয়া ধানের গোছার মতো
ক্ষিপ্রতার সাথে সময় দাপানো ছেলেটাকে তুলে নিল কৃষক।
আজ আসরের আযানের আগেই ঘরে ফিরতে হবে তাকে।

তুমি তখন থেকো সুখে

মণিকাঞ্চন ঘোষ প্রজীৎ

গোধূলিতে আটকানো সিঁদুররাঙা মেঘের মতো
উবু হয়ে বসে বসে আলো জ্বালে সন্ধ্যা তারা
মিটিমিটি সে আলোয় ঘরে ফিরে আসে শঙ্খচিল;
এই ভরা ফাগুনের দিনেও তার হৃদয়ে আসেনি অন্তমিল
কুমার নদীর কালো জল অগাধ পিপাসাতেও দেয়নি সাড়া
তাই নিমিষেই হৃদয় বীণার তার ছিঁড়ে হয়ে গেছে ক্ষতবিক্ষত।
এখানে এই সোঁদা মাটির বুকে; অনিন্দ্য সুখে
বসবাস করে কিছু উদাসী চারুলতা; গোপনে বলে কথা
রক্তিম আভার মতো রক্তের লাল রং তার সারা বুকে
মনের ভেতরে সুন্দরবনের মতো অগাধ নীরবতা।
বসন্ত বিলাসের সময় এখন নেই
সময়ের ব্যবধানে বদলে গেছে ইতিহাসের সুর
সমস্ত রাত নিশাচরের মতো জেগে জেগে জেনে গেছি এই–
এ জীবন ধোঁয়াশার মতো বেদনাবিঁধুর।
তবুও ফাগুনের চাঁদ আগুন ঝরিয়ে হাসে
এলোমেলো গোলাপের গন্ধে দখিনা বাতাসে
চাতকেরা যায় ঘরে ফিরে; অনিমেষ আড়ালে
বসে থাকে জোছনালতার ডাল; দুটি হাত বাড়ালে
তুমিও হয়ত খুঁজে পাবে নিশুতি রাত
সন্ধ্যার তারাগুলো নিভে যাবে রাতের কালোয়
ধল প্রহর রাতে তখন শুকতারা দেবে পাহারা; আসবে প্রভাত
হয়ত তখন শাল-পিয়ালিরা ঘুমাবে তোমার বুকে
হে প্রিয় বাংলাদেশ! তুমি তখন থেকো সুখে।

ঢেউভাঙা দ্বীপে

সামসুন্নাহার ফারুক

চোখের কোনায় বিদ্যুৎ খেলে
সেদিন বলেছিলে
এতসব লুকোচুরি বাঁকা কথা
ভালো লাগে না আর
চলো না যাই ভেসে
ঢেউভাঙা দ্বীপের দেশে
খুঁজে পেতে রাশি রাশি
জোছনা সমাহার
হৃদয়ের হোলি উৎসবে
মনকাড়া সুরে
অলৌকিক শব্দমালার
ঐশ্বর্যের ভিড়ে
শুনব নির্জনতার সিম্ফনি
পৃথিবীর শুদ্ধতম গান
আদিম মন্দিরে মেখে রাতের বিলাস
অবারিত নীলিমায় পাহাড়ে উপত্যকায়
ছড়িয়ে দেব শতাব্দীর স্বপ্ন
গ্রহে-গ্রহান্তরে ভালোবাসার দরিয়ায়
কৃষ্ণ গহ্বরের হা-মুখে
বেঁচে থাকার সুমধুর নির্যাস
গ্যালাক্সির মালা পরে
নীল টিপে হাসবে আকাশ।

কবির বসন্ত

পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

বসন্ত ঋতুকে বুঝি কবির প্রার্থনা– ঋতুরাজ!
এসো তুমি কবিতার উপাদান (রং, রূপ) নিয়ে
ঘুম ভেঙে দিয়ে যাও ঘুমপ্রেমী প্রকৃতির আজ
সাজ সাজ রবে যাও একবার ব্রহ্মাণ্ড মাতিয়ে।
কবির প্রার্থনা শুনে পৃথিবীতে ঋতুরাজ আসে
গাছে গাছে কচি পাতা, ফুল-ফল, পাখির সংগীতে
প্রজাপতি, অলি, মৌ, ভ্রমর ওড়ে দখিনা বাতাসে
অপূর্ণ কবির প্রাণ রীতিমতো পূর্ণ করে দিতে।
বসন্ত কবির জন্য নিয়ে আসে শব্দ, ছন্দ, তাল
কবিও তো বুনে যায় মোহনীয় উপমার জাল।

দুচোখের নোনা জলে

রুহুল গনি জ্যোতি

কবিতা পণ্য নয়– বাজারে বিকোবে না তাই
সেতো জানা আছে বেশ
তবুতো চেষ্টা অশেষ প্রাণান্ত কসরত
তবুতো রাত জেগে জেগে অযথাই
হৃদয়ে ভালোবাসা পুষে রাখা
চুপি চুপি মনের গভীরে স্বপ্নের বীজ বোনা
একদিন হবে তা অঙ্কুরিত– এই ভাবনায়
হয়ত বা হবে না তা
হয়ত বা ডানা মেলে উড়বে না পাখি
ফুটবে না শত ফুল
তাতেই বা কী আসে যায়
মনে তবু আশা ধরে রাখি
নেই কোনো দুঃখ
নেই কোনো ক্ষোভ-বিক্ষোভ
অহেতুক মান-অভিমান– কিছুই রাখিনি পুষে।
ভালোবাসা মূল্যহীন, এক পয়সাও বিকোবে না জানি
কবির জীবনে তবু সেই এক সত্য হয়ে থাকে
সে এক অমূল্য রতন
বাকি সব ভেসে চলে যায়– দুচোখের নোনা জলে।

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

ডাকসু নির্বাচন করার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, দেশের গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্তিশালী করতে নতুন ছাত্র নেতৃত্বের বিকাশে অবশ্যই ডাকসু নির্বাচন করতে হবে। ৪ঠা মার্চ দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৪ঠা মার্চ ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

তিনি বলেন, দেশে যোগ্য ও সৎ নেতৃত্ব গড়ে না উঠলে জাতির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে উঠবে না। দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। আর এ নেতৃত্ব গড়ে উঠবে ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে উন্নত মানবসম্পদ গড়ার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, ১৯২১ সালের ১লা জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়টি চালু হওয়ার পর থেকে আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়টি গতিশীল এবং বাস্তবভিত্তিক বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু নির্বাচন আবশ্যক। এ নির্বাচন না হলে ভবিষ্যতে এদেশে নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টি হবে।

রাষ্ট্রপতি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, চাকরির সুবাদে বিশ্বের যেখানেই থাকুন না কেন, এই দেশ, দেশের মানুষকে ভুলে না যাওয়ার পাশাপাশি কোনো মিথ্যা ও অশুভ শক্তির কাছে মাথা নত করবেন না।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি আরো বলেন, মেধা, প্রজ্ঞা ও কাজের মাধ্যমে নিজ নিজ জায়গা থেকে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে অবশ্যই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

এবারের সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬১ জন গবেষককে পিএইচডি, ৪৩ জনকে এমফিল, ৮০ জনকে স্বর্ণপদক এবং ১৭ হাজার ৮৭৫ জন গ্র্যাজুয়েটকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

৮ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা মার্চ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নতুন সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনসহ ৮ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্‌বোধন করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বালানোর লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের একটি ঘরও আর অন্ধকারে থাকবে না। তিনি সততা ও দক্ষতার সাহায্যে উৎপাদন করে বর্তমানে ১৫৩৫১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে বলে উল্লেখ করেন এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবাইকে সাশ্রয়ী হওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। পরে তিনি সরাসরি কোটালিপাড়া, মুজিবনগর, ভুয়াপুর, সৈয়দপুর, জামালপুর, বান্দরবানের থানচি এবং কালিয়াকৈরবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

খেলাধুলায় সহায়তা প্রদানে এগিয়ে আসার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা মার্চ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬' এবং 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬'-এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের ছেলেমেয়েরা খেলাধুলার দিকে নজর দিক। এগিয়ে যাক। খেলাধুলার মাধ্যমে আমাদের ছেলেমেয়েরা দেশপ্রেমিক হবে। দেশের দিকে আরো নজর দেবে'। তিনি খেলাধুলায় উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করতে বিত্তবান, জনপ্রতিনিধিসহ সমাজের সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সামুদ্রিক সহযোগিতা জোরদার করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই মার্চ ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা কনভেনশন সেন্টারে প্রথমবারের মতো ভারত মহাসাগর রিম অ্যাসোসিয়েশন সামিটে 'একটি শান্তিপূর্ণ স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ ভারত মহাসাগরের জন্য রিম সামুদ্রিক সহযোগিতা জোরদারকরণ' শীর্ষক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ভারত মহাসাগরের জন্য সামুদ্রিক সহযোগিতা জোরদার করে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করতে ভারত মহাসাগর রিম অ্যাসোসিয়েশন (আইওআরএ)-এর নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি সমুদ্রগামী নাবিকদের নিরাপত্তা এবং পেশাগত অধিকার নিশ্চিত করারও আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী দক্ষ নাবিক পুল তৈরিতে বাংলাদেশ-ভারত মহাসাগর কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তিনি সমুদ্র অংশীদারিত্ব

জোরদারে 'আইওআরএ কনকর্ড' এবং তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য আইওআরএ-এর নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানান। সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন এবং মিয়ানমারের শরণার্থীদের তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে ইন্দোনেশীয় সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিমন্ত্রী ড. মাইথা খালেম আল শামমির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশি নাগরিকদের বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের জন্য ভিসা প্রদান ব্যবস্থা সহজ করতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে মার্চ ২০১৭ ফার্মগেটস্থ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন –পিআইডি

চট্টগ্রাম নৌ–জেটিতে নবযাত্রা ও জয়যাত্রা সাবমেরিন উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই মার্চ চট্টগ্রাম নৌ-জেটিতে 'নবযাত্রা' এবং 'জয়যাত্রা' নামে দুইটি সাবমেরিন উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সাবমেরিন যুগে প্রবেশ করল এবং এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী একটি ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। তিনি বলেন, বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে একটি ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা ফোর্সেস গোল ২০৩০ অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে।

স্ট্যান্ডার্ডস ওজন ও পরিমাপ আইন ২০১৭-এর অনুমোদন

কঠোর শাস্তির বিধান রেখে 'স্ট্যান্ডার্ডস ওজন ও পরিমাপ আইন ২০১৭'-এর অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা । ১৩ই মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। এ আইনে স্ট্যান্ডার্ডস ওজন ও পরিমাপ কাজে অসাধুতা করার অভিযোগ প্রমাণিত হলে ২ বছরের কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বিধান রাখা হয়েছে। আইনে কেউ সরকারি অনুমোদন ব্যতীত কোনো ওজন ও পরিমাপ যন্ত্র ব্যবহার করলে তার সর্বোচ্চ শাস্তি ৬ মাসের কারাদণ্ড এবং ২০ হাজার টাকা জরিমানা।

তাঁত শিল্পকে সহযোগিতা করার আশ্বাস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯শে মার্চ ফার্মগেটস্থ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ তাঁতী লীগের জাতীয় সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী তাঁত শিল্পকে একটি উন্নতমানের শিল্প হিসেবে উল্লেখ করেন এবং তাঁতীদের মেধারও প্রশংসা করেন। তাঁত শিল্পের উন্নয়নকে কীভাবে আরো সম্প্রসারিত করা যায় সেটাই তাঁর সরকারের লক্ষ্য বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন ২০১৭-এর খসড়ার অনুমোদন

শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও বাড়িঘর নির্মাণ এবং যে-কোনো উন্নয়ন কাজে ভূমি ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র নেওয়ার বাধ্যবাধকতা রেখে 'নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন ২০১৭'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০শে মার্চ সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। এই নিয়ম না মানলে ৫ বছর কারাদণ্ডের সঙ্গে ৫০ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে আইনে।

মাগুরায় উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে মার্চ মাগুরা সফর করেন। মাগুরায় তিনি প্রায় ৩১০ কোটি টাকার ১৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন এবং ৯টি নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি মাগুরাবাসীর জন্য রেললাইন নির্মাণের আশ্বাস দেন এবং ২০২১ সালের মধ্যে কোনো ঘর অন্ধকার থাকবে না, সব জায়গায় বিদ্যুৎ যাবে বলে উল্লেখ করেন।

সশস্ত্রবাহিনীর সমরাস্ত্র প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে মার্চ জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সম্মিলিত সমরাস্ত্র প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী তিন বাহিনীর বিভিন্ন স্টল ও প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন হালকা ও ভারী সমরাস্ত্র প্রত্যক্ষ করেন। এছাড়া তিনি যুদ্ধের সময় সশস্ত্রবাহিনীর অবদান ও সাহসিকতাপূর্ণ ঘটনা স্থান পাওয়া স্টলগুলো ঘুরে দেখেন। পরে তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং অন্যান্য শিল্পীদের পরিবেশিত সংগীত ও নৃত্য উপভোগ করেন।

কারাগারের রোজনামচা গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে মার্চ বাংলা একাডেমির উদ্যোগে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৩২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। মোড়ক উন্মোচনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু এদেশের জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি এদেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার দায়িত্ব দেশবাসীর বলে উল্লেখ করেন।

ফরিদপুরসহ ৫ জেলা নিয়ে বিভাগ গঠনের আশ্বাস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯শে মার্চ ফরিদপুর সফর করেন। ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ মাঠে এক জনসভায় তিনি ঢাকা বিভাগকে ভেঙে ফরিদপুরসহ ৫ জেলা নিয়ে পৃথক একটি বিভাগ গঠনের আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ আমাদের পথ নয়। এর বিরুদ্ধে সমগ্র জনগণকে রুখে দাঁড়াতে হবে। পরে তিনি জনসভাস্থলেই ২০টি প্রকল্পের উদ্‌বোধন এবং ১২টি নতুন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। **প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম**

তথ্যমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

নবম ওয়েজবোর্ড দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ৯ই মার্চ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ সংবাদপত্র কর্মচারী ফেডারেশন ও বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব নিউজ পেপার প্রেস ওয়ার্কার্স প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভায় বলেন, নবম ওয়েজবোর্ড দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার।

মন্ত্রী বলেন, এ বছর জানুয়ারি মাসে ৯ম ওয়েজবোর্ড গঠনের প্রস্তাব অনুমোদনের সাথে সাথেই বোর্ডের সভাপতিসহ ৯ সদস্যবিশিষ্ট পরিষদ গঠনের জন্য যথাযথ সংস্থাগুলোর কাছে মনোনয়ন চাওয়া হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব নিউজ পেপার প্রেস ওয়ার্কার্স প্রতিনিধিদের নাম পাওয়া গেছে। নিউজ পেপার্স ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) এবং বাংলাদেশ সংবাদপত্র কর্মচারী ফেডারেশন প্রতিনিধিদের নামও শীঘ্রই পাওয়া যাবে বলে আশা করছে মন্ত্রণালয়।

জঙ্গি, দারিদ্র্য ও লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে শূন্যসহিষ্ণু নীতি

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ২রা মার্চ রাজধানীর ফার্মগেটে *দি ডেইলি স্টার* ভবনের মিলনায়তনে বেসরকারি সংস্থা কর্মজীবী নারী আয়োজিত নারী শ্রমিক কণ্ঠের মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, জঙ্গি, দারিদ্র্য ও লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে শূন্যসহিষ্ণু নীতি ট্রেড ইউনিয়নসহ সব খাতে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে।

তিনি বলেন, জঙ্গি দমন, দারিদ্র্য উচ্ছেদ ও লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে সরকার শূন্যসহিষ্ণুতার নীতিতে অটল। আর সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার ও জঙ্গি-সন্ত্রাস নারী সমাজের সবচেয়ে বড়ো শত্রু।

নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করতেই হবে

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাব আয়োজিত 'নারী-পুরুষের বৈষম্যহীন গণমাধ্যম চাই' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, টেকসই উন্নয়ন ও বৈষম্যমুক্ত সমৃদ্ধির জন্য সমাজ ও অর্থনীতি থেকে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করতেই হবে। বাংলাদেশকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে এখন থেকেই এ বিষয়ে সকল খাতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার বিকল্প নেই। গণমাধ্যমসহ সকল কর্মক্ষেত্রে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ, নারী-পুরুষ সমতায়নে নীতিমালা, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং নারীদের গৃহ ও কর্মক্ষেত্রের মধ্যে যাতায়াত সুবিধা কাঠামো গড়ে তোলার ওপর জোর দেন মন্ত্রী।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ৯ই মার্চ ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে 'তথ্য অধিকার আইন ও গভীরতাধর্মী সাংবাদিকতা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

সঠিক তথ্যপ্রবাহের মাধ্যমে জনবিভ্রান্তি নিরসন করতে হবে

তথ্যমন্ত্রী ৯ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত 'তথ্য অধিকার আইন ও গভীরতাধর্মী সাংবাদিকতা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, সঠিক তথ্যপ্রবাহের মাধ্যমে জনবিভ্রান্তি নিরসন করতে হবে। **প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন**

আমাদের স্বাধীনতা : বিশেষ প্রতিবেদন

২৫শে মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস পালন

২৫শে মার্চ, জাতীয় গণহত্যা দিবস। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাত্রিতে ঢাকায় পাকিস্তান হানাদারবাহিনী কর্তৃক বর্বরোচিত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই মার্চ ২০১৭ জাতীয় সংসদ অধিবেশনে ২৫শে মার্চকে জাতীয়ভাবে 'গণহত্যা দিবস' ঘোষণা করার প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় বক্তৃতা করেন –পিআইডি

হামলার সেই বিয়োগাত্মক ঘটনার স্মরণে এবারই প্রথমবারের মতো 'জাতীয় গণহত্যা দিবস' হিসেবে পালিত হয়েছে। স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস এবং একুশে ফেব্রুয়ারির মতোই ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘটানো গণহত্যার দিনটি জাতীয়ভাবে 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। স্বাধীনতার প্রায় ৪৬ বছর পর ২০১৭ সালের ১১ই মার্চ জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব পাস হয়। সংসদে পাস হওয়ার পর ২০শে মার্চ মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ দিবসটি পালনে ২১শে মার্চ প্রজ্ঞাপন জারি করে। দিবসটি আন্তর্জাতিকভাবে পালনের জন্য জাতিসংঘে প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সমর্থন আদায়ে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। একাত্তরের অগ্নিঝরা এই দিনে বাঙালির জীবনে নেমে

আসে নৃশংস ও বিভীষিকাময় কালরাত্রি। এ রাতে বর্বর পাকবাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে স্বাধীনতাকামী বাঙালির ওপর হিংস্র দানবের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর এদিন বাঙালি জাতি তথা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছিল ইতিহাসের এক নৃশংস বর্বরতা।

২৫শে মার্চ রাত সোয়া ১টার দিকে একদল সৈন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। তারা গুলি ছুড়তে ছুড়তে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে। তখন বঙ্গবন্ধু বীরের মতো দোতলার ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়ান। রাত ১টা ২৫ মিনিটের দিকে এ বাড়ির টেলিফোনের লাইন কেটে দেওয়া হয়। এ সময় বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে চিরতরে নস্যাতের জন্য বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় হায়েনার দল। অবশ্য গ্রেফতার হওয়ার আগেই ২৫শে মার্চ মধ্যরাতের পর অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন ইপিআর-এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দেন। আর এই ওয়্যারলেস বার্তা চট্টগ্রাম ইপিআর সদর দফতরে পৌঁছে। চট্টগ্রাম উপকূলে নোঙ্গর করা একটি বিদেশি জাহাজও এ বার্তা গ্রহণ করে। তখন চট্টগ্রামে অবস্থানরত আওয়ামী লীগের তৎকালীন শ্রম বিষয়ক সম্পাদক জহুর আহমেদ চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা সেই রাতেই সাইক্লোস্টাইল করে শহরবাসীর মধ্যে বিলির ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধুর এই স্বাধীনতার ঘোষণার ভিত্তিতেই ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। এই রাত একদিকে যেমন বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম মুহূর্তটি প্রত্যক্ষ করেছিল, তেমনি এ রাতেই সূচিত হয়েছিল জঘন্যতম গণহত্যা।

প্রতিবেদন : মো. লিয়াকত হোসেন ভূঞা

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে মার্চ ২০১৭ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন –পিআইডি

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক তিন অ্যাপ উদ্‌বোধন

১লা মার্চ : রাজধানী ঢাকা ক্লাবের স্যামসন এইচ চৌধুরী মিলনায়তনে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু আনুষ্ঠানিকভাবে রোগী, চিকিৎসক, স্বাস্থ্য খাতের সব পেশার মানুষের ব্যবহারের জন্য তিনটি অ্যাপ ও ওয়েব সার্ভিসের উদ্‌বোধন করেন। অ্যাপটি তৈরি করেছেন কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশি চিকিৎসক অসিত বর্ধন।

আন্তর্জাতিক পোলট্রি শো

২রা মার্চ : রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা হল ১-এ তিন দিনব্যাপী দশম আন্তর্জাতিক পোলট্রি শো ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ২০টি দেশের প্রায় ১৯৫টি কোম্পানি অংশ নেয়। শো ও সেমিনার উদ্‌বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী।

বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস

৪ঠা মার্চ : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস'। কর্মসূচির প্রতিপাদ্য ছিল, 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে তরুণদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাই'।

জাতীয় পাট দিবস পালিত

৬ই মার্চ : প্রথমবারের মতো নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সারাদেশে পালিত হয় 'জাতীয় পাট দিবস'। দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল 'সোনালি আঁশের সোনার দেশ, পাট পণ্যের বাংলাদেশ'।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালন

৭ই মার্চ : বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের স্মৃতি বিজড়িত দিবসটি পালন করে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপিত

৮ই মার্চ : বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'নারী-পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা, বদলে যাবে বিশ্ব, কর্মে নতুন মাত্রা'।

বিশ্ব কিডনি দিবস পালিত

৯ই মার্চ : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব কিডনি দিবস'। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'স্থূলতা কিডনি রোগ বাড়ায়, সুস্থ জীবনযাপনে সুস্থ কিডনি'।

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস

১০ই মার্চ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করা হয় 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'দুর্যোগ প্রস্তুতি সারাক্ষণ, আনবে টেকসই উন্নয়ন'।

বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস

১৫ই মার্চ : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'ভোক্তার আস্থাশীল ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ি'।

১৬ই মার্চ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মেধাবী শিক্ষার্থী, বিজ্ঞানী ও গবেষকদের বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ এবং গবেষণা অনুদান প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

১৭ই মার্চ : জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও মৌলবাদী অপশক্তিকে রুখে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের দৃঢ় শপথের মধ্য দিয়ে সারাদেশে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মদিন পালিত হয়। একই সাথে দিনটিকে 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবেও উদ্‌যাপন করা হয়।

কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বর্ণপদক বিতরণ

২২শে মার্চ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর তেজগাঁওয়ের কার্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) প্রদত্ত 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৩ ও ২০১৪' প্রদান করেন কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে।

❑ বিশ্ব পানি দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব পানি দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'বর্জ্য পানি কমিয়ে আনি, অপচয় রোধ করি, টেকসই উন্নয়নে সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করি'।

স্বাধীনতা পুরস্কার বিতরণ

২৩শে মার্চ : ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৭' বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এবার বিমানবাহিনী স্বাধীনতা পুরস্কার পায়। এর সঙ্গে ১৪ ব্যক্তি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ এই পুরস্কার পান।

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস

২৪শে মার্চ: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'ঐক্যবদ্ধ হলে সবে, যক্ষ্মামুক্ত দেশ হবে'।

জাতীয় গণহত্যা দিবস পালিত

২৫শে মার্চ : প্রথমবারের মতো নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেশজুড়ে পালিত হয় 'জাতীয় গণহত্যা দিবস'।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

২৬শে মার্চ : মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার শপথে সারাদেশে বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করে 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস'।

❑ শিশু-কিশোর সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী

জাতীয় স্টেডিয়ামে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে শিশু-কিশোর সমাবেশ ও কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশু-কিশোরদের ভবিষ্যতের নেতা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান। **প্রতিবেদন : আখতার শাহীমা হক**

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশে সাবমেরিন যুগ শুরু

১২ই মার্চ চট্টগ্রামের নৌঘাঁটি ঈশা খাঁয় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম দুটি সাবমেরিন বানৌজা 'নবযাত্রা' ও বানৌজা 'জয়যাত্রা'র কমিশনিং হয়। দেশের সংকটময় মুহূর্তে এ দুটি সাবমেরিন আত্মরক্ষার্থে সাহায্য করবে । বিশ্বের মাত্র কয়েকটি দেশ সাবমেরিন পরিচালনা করে। বাংলাদেশের নাম এখন সেই তালিকায়। ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নৌবাহিনীকে নেভাল এনসাইন প্রদান করেছিলেন। জাতির পিতার দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য সাবমেরিন সংযুক্ত করেছে সরকার।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই মার্চ ২০১৭ চট্টগ্রামে বানৌজা ঈসা খাঁ'র নৌ-জেটিতে সুইচ টিপে 'নবযাত্রা' ও 'জয়যাত্রা' সাবমেরিন উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি

পাকা সড়ক নির্মাণে এশিয়ার সেরা

এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে পাকা সড়ক বেশি। প্রতি একশ কিলোমিটারে পাকা সড়ক ২৩০ কিলোমিটার। গত নয় বছর ব্যাপক উন্নয়ন হয় গ্রামের সড়ক ব্যবস্থায়। এই সড়কই গ্রামের অর্থনীতিকে করেছে সুদৃঢ়। উৎপাদিত ফসল বিপণন, কুটির শিল্পের প্রসার, বিদেশে ফসল রপ্তানিসহ উন্নয়নের সকল বিষয়েই গ্রামকে যুক্ত করেছে পাকা সড়ক।

ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে

মাত্র ৭ বছরের ব্যবধানে দেশে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে ৯৬ লাখ মেট্রিক টন। সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ এই সাফল্য দেখে। ইলিশের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে সরকার নির্বিচারে জাটকা নিধন প্রতিরোধে ৯০০ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করেছে। দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ১১ শতাংশ ইলিশ। জিডিপিতে ইলিশের অবদান ১ শতাংশ। প্রায় ৫ লাখ লোক ইলিশ আহরণে সরাসরি জড়িত। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যেখানে ইলিশের উৎপাদন ছিল ২ কোটি ৯৯ লাখ মেট্রিক টন। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৩ কোটি ৯৫ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

মানব উন্নয়ন সূচকে অগ্রগতি

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) সম্প্রতি 'মানব উন্নয়ন সূচক ২০১৬' প্রকাশ করেছে। সে অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম। এর আগে ছিল ১৪০তম। সূচকে শীর্ষস্থান নরওয়ের। ভারতের অবস্থান ১৩১তম আর পাকিস্তানের ১৪৭তম। সূচকটিতে চারটি স্তর আছে।

বাংলাদেশ রয়েছে মধ্যম মানব উন্নয়ন ক্যাটাগরিতে।

দুর্গম এলাকায় অপটিক্যাল ফাইবার

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে ইন্টারনেট পৌঁছাতে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ পর্যায়ে দেশের ৭৭২টি ইউনিয়নে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে দুর্গম জনপদে বসানো হবে উচ্চমানের রেডিও ডিভাইস। ইন্টারনেটের অভাবে দেশের কিছু জনপদের মানুষ পিছিয়ে আছে বিশ্ব থেকে। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত প্রকল্পে অধিকতর দুর্যোগপ্রবণ ৫০টি ইউনিয়ন এবং ১৭টিকে অধিক দুর্গম চিহ্নিত করে রেডিও ডিভাইস এবং 'হাই ক্যাপাসিটি রেডিও' বসানো হবে।

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা এপ্রিল ২০১৭ জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ)-এর যৌথ উদ্যোগে ১৩৬তম আইপিইউ অ্যাসেম্বলির উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

আইপিইউ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

পাঁচ দফা ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে ৫ই এপ্রিল শেষ হয়েছে পাঁচ দিনব্যাপী ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (আইপিইউ) ১৩৬তম সম্মেলন। সম্মেলনে বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য কমানোর অঙ্গীকার নিয়েছে সংগঠনটি। ঢাকা ঘোষণায় বলা হয়েছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৈষম্য কমাতে মানবাধিকার সুরক্ষায় আইনি কাঠামো শক্তিশালী এবং বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। সবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্থান হিসেবে পার্লামেন্টকে শক্তিশালী করতে হবে। সব জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে। রাজস্ব আহরণের আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ঘোষণায়। এছাড়া শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে। সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ১লা এপ্রিল এ সম্মেলন উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৩২টি দেশের প্রতিনিধি দল এতে অংশ নেয়। এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য– 'রিড্রেসিং ইনইকুয়ালিটিজ ডেলিভারিং অন ডিগনিটি অ্যান্ড ওয়েল বিং ফর অল'।

জঙ্গিবাদ দমনে সৌদি আরবের পাশে থাকবে বাংলাদেশ

জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ দমনে সৌদি আরবের ভূমিকার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ দমনের যে-কোনো পদক্ষেপে বাংলাদেশ সৌদি আরবের পাশে আছে এবং একসঙ্গে কাজ করবে। সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে প্রচারণা চালানোর জন্য মুসলিম দেশগুলোর প্রতিও তিনি আহ্বান জানান। ৬ই এপ্রিল ঢাকায় ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী এ ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, সৌদি বাদশাহ যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেখান থেকে যাতে পবিত্র ইসলাম ধর্মে শান্তি আসে, তাদের মধ্যে যেন ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়, তারা যেন শান্তির পথে ফিরে আসে সেজন্য আমরা আগেও বলেছি, তাঁর পাশে আছি এবং থাকব।

সম্মেলনে সৌদি আরবের পবিত্র মসজিদুল হারাম ও মসজিদুন নববির ভাইস প্রেসিডেন্ট শায়খ ড. মুহাম্মদ বিন নাসির আল খুযাইম বলেন, 'নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা ইসলামে বড়ো অপরাধ'। এমনকি নিরপরাধ বিধর্মীকেও হত্যা করা যাবে না । মুসলিম দেশে বসবাসকারী বিধর্মীদের জানমাল রক্ষার দায়িত্ব মুসলমানদের। তিনি বলেন, ইসলাম হচ্ছে বিশ্বের সব মানুষের বড়ো মানবতার ধর্ম। যারা দেশের শান্তি বিনষ্ট করতে চায় তাদের স্থান হবে জাহান্নামে। সন্ত্রাস দমনে ভূমিকার জন্য তিনি বাংলাদেশের প্রশংসা করেন। সম্মেলনে মসজিদে নববির ইমাম ও খতিব শায়খ ড. আবদুল মুহসিন বিন মুহাম্মদ বিন আল কাসিম বক্তৃতায় বলেন, ইসলাম সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত ধর্ম। এটি সকল মানুষের ধর্ম। ইসলাম বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো মানবতার ধর্ম। যিনি দেশ পরিচালনা করছেন, সবাই একত্র হয়ে তাঁর হাত মজবুত করার কথাও ইসলামে বলা হয়েছে।

প্রবাসীরা তিন দিনেই পাসপোর্ট পাবেন

পাসপোর্ট তৈরির তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যেই তা বিশ্বের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই এপ্রিল ২০১৭ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পবিত্র মসজিদুল হারাম ও মসজিদুন নববি কর্তৃপক্ষের ভাইস প্রেসিডেন্ট শায়খ ড. মুহাম্মদ বিন নাসির আল খুযাইমকে ক্রেস্ট প্রদান করেন –পিআইডি

বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর (ডিআইপি)। এর জন্য আন্তর্জাতিক বেসরকারি পোস্টাল সার্ভিস ফেডারেল এক্সপ্রেসের (ফিডেক্স) সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে। চুক্তির আওতায় ৬৫টি দেশে প্রবাসীদের কাছে সর্বোচ্চ পাঁচ দিনের মধ্যেই পাসপোর্ট পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। চুক্তির আগে পাসপোর্ট ছাপার পরও ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে যেতে ও সংশ্লিষ্ট দূতাবাসে পৌঁছাতে তিন মাস সময় লাগত। ২রা এপ্রিল আগারগাঁওয়ে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এক অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানান।

প্রতিবেদন : সাবিনা ইয়াসমিন

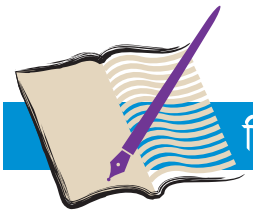

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

শিক্ষকদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাঠদান করার আহ্বান

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মো. মোস্তাফিজুর রহমান ১৯শে মার্চ সাতক্ষীরায় শিক্ষক সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশে ভাষণকালে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। এলক্ষ্যে সরকার শিশুদের ঝরেপড়া রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি শিক্ষকদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে তাদের সম্পদে পরিণত করার আহ্বান জানান।

বিশ্বসেরা ৫০ শিক্ষকের একজন বাংলাদেশের শাহনাজ পারভীন

বিশ্বের শীর্ষ ৫০ জন শিক্ষকের একজন হিসেবে পুরস্কার গ্রহণ করেন বাংলাদেশের শাহনাজ পারভীন। দুদিনব্যাপী সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত '৫ম গ্লোবাল এডুকেশন ও স্কিলস ফোরাম' সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন (২০শে মার্চ ২০১৭) 'গ্লোবাল টিচার্স প্রাইজ' শীর্ষক পুরস্কার বিশ্বসেরা শিক্ষকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থীদের মানবসম্পদে পরিণত করার আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২১শে মার্চ সাইথ-ইস্ট ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে মন্ত্রী শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রেখে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন : মো. সেলিম

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

'চ্যাম্পিয়ন ফর অটিজম ইন সাউথ-ইস্ট এশিয়া রিজিয়ন' মনোনীত হলেন সায়মা ওয়াজেদ

অটিজম এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার বিষয়ক বাংলাদেশ ন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কমিটির চেয়ারপারসন সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে 'চ্যাম্পিয়ন ফর অটিজম ইন সাউথ-ইস্ট এশিয়া

২রা এপ্রিল ২০১৭ অটিজম এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার বিষয়ক বাংলাদেশ ন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কমিটির চেয়ারপারসন সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) 'চ্যাম্পিয়ন ফর অটিজম ইন সাউথ-ইস্ট এশিয়া রিজিয়ন' নির্বাচিত করে পুরস্কার প্রদান করে

রিজিয়ন' (অটিজম বিষয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের চ্যাম্পিয়ন) নির্বাচিত করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। অটিজম আক্রান্ত শিশুদের জন্য কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ২রা এপ্রিল বিশ্ব অটিজম দিবসে তাঁকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

তিনি জাতীয় নীতিমালা ও কৌশল বিষয়ে প্রচারণার জন্য ১১টি সদস্য দেশের সঙ্গে অ্যাডভোকেসিতে সহায়তা দিবেন। তাঁকে অটিজমের জন্য একজন শক্তিশালী প্রচারক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক কার্যালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক ড. পুনম ক্ষেত্রপাল সিং বলেন, 'সিয়ারোভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অটিজম নিয়ে সবার আগে কাজ শুরু করে। এক্ষেত্রে সায়মা ওয়াজেদ অগ্রপথিক হিসেবে কাজ করছেন।'

অটিজম মোকাবিলায় প্রয়োজন আন্তঃখাত কর্মসূচি

অটিজম মোকাবিলায় পরিবারগুলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী জীবনব্যাপী অধিকতর সাশ্রয়ী, টেকসই ও সহায়ক আন্তঃখাত কর্মসূচি প্রণয়নের আহ্বান জানিয়েছেন সায়মা ওয়াজেদ। তিনি বলেন, 'অটিজম মোকাবিলায় এমন কোনো সহজ সমাধান নেই যার মাধ্যমে বিদ্যমান চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তা বাস্তবায়িত করা যায়। এর পরিবর্তে পরিবারগুলোর প্রয়োজন অনুযায়ী জীবনব্যাপী অধিকতর সাশ্রয়ী, টেকসই ও সহায়ক আন্তঃখাত কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। তিনি বলেন, গত পাঁচ বছরে রাজনৈতিক সমর্থন ও জাতীয় শিক্ষানীতির কারণে বাংলাদেশে অটিজমের ওপর সচেতনতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তহবিল ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার মাঝেও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

সুবর্ণ নাগরিক কার্ড পাচ্ছে শনাক্ত হওয়া প্রতিবন্ধীরা

প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির পরিচালক ডা. আশরাফী আহমদ জানান, গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কর্মসূচির আওতায় ১৫ লক্ষ ৯ হাজার ৭১৬ জন প্রতিবন্ধী শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৪৫ হাজার ৪০৪ জন অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

তিনি আরো জানান, অটিজমসহ প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষা আইন অনুযায়ী শনাক্ত হওয়া প্রতিবন্ধীদের 'সুবর্ণ নাগরিক কার্ড' দেওয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ১৩ লাখের বেশি প্রতিবন্ধী এই কার্ড পেয়েছে। **প্রতিবেদন : হাছিনা আক্তার**

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

ভুয়া চিকিৎসক চেনাবে নিবন্ধন নম্বর

ভুয়া চিকিৎসক শনাক্ত করতে চিকিৎসকদের ভিজিটিং কার্ড, ব্যবস্থাপত্র, নামফলক ও সাইনবোর্ডে তাদের নিবন্ধন নম্বর উল্লেখ করার পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি)। এ বিষয়ে সম্প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে পেশাজীবী চিকিৎসকদের নিয়ন্ত্রণকারী এ সংস্থা। বিএমডিসি বলছে, কাউন্সিলের নিবন্ধিত চিকিৎসক প্রায় ৮০ হাজার। বিএমডিসির ওয়েবসাইটে (http://bmdc.org.bd/doctors-info/) ছবিসহ নিবন্ধিত সব চিকিৎসকদের নিবন্ধন নম্বর আছে।

আধুনিক অস্ত্রোপচার কমপ্লেক্স

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) আধুনিক মডিউলার অস্ত্রোপচার (অপারেশন থিয়েটার) কমপ্লেক্সের উদ্‌বোধন করা হয়েছে। ১৪ই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবিন ব্লকের একাদশ তলায় এই কমপ্লেক্সের উদ্‌বোধন করা হয়। এতে থাকছে নিউরো সার্জারি, জেনারেল সার্জারি, ইউরোলজি ও নাক-কান-গলা বিভাগের আধুনিক মডিউলার অস্ত্রোপচার ও রিকভারি কক্ষ।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ১লা মার্চ ২০১৭ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন –পিআইডি

মানের প্রশ্নে কোনো আপোশ নয়

মেডিক্যাল শিক্ষার সাথে মানুষের জীবন-মরণের সম্পর্ক। বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর মান বজায় রাখতে হবে। মানের প্রশ্নে কোনো আপোশ করা হবে না। ১লা মার্চ হেলথ রিপোর্টার্স ফোরাম আয়োজিত সচিবালয়ে 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এসব কথা বলেন।

জাতীয় ক্যানসার সম্মেলন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় ক্যানসার সম্মেলন। ক্যানসার প্রতিরোধ ও গবেষণা কেন্দ্র, ওজিএসবি, সার্জিক্যাল অনকোলজি গ্রুপ, ক্যানসার এপিডেমিওলজি সোসাইটি অব বাংলাদেশ যৌথভাবে দিনব্যাপী এ সম্মেলনের আয়োজন করে। ক্যানসারের অর্থসামাজিক প্রভাব এবং স্বাস্থ্য বিমার ভূমিকা, ক্যানসার সচেতনতা বাড়াতে গণমাধ্যমের ভূমিকাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় তিনটি অধিবেশনে।

বিশ্ব কিডনি দিবস

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ৯ই মার্চ পালিত হয় বিশ্ব কিডনি দিবস। কিডনি দিবস উপলক্ষে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশ রেনাল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, কিডনি প্রতিস্থাপন আইনের জটিলতা দূর করতে মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন সংশোধন চূড়ান্ত হওয়ার পথে। দিবসটি উপলক্ষে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র 'বাংলাদেশ কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এ পর্যন্ত দেশে ১ হাজার ৪৭৪টি কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছে।

৫০ রোগের ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় টাঙ্গাইলের তিনটি উপজেলায় 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি' নামে দিশারী প্রকল্প শুরু করেছে। এর আওতায় ৫০ ধরনের রোগের ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে সেখানে। এই কর্মসূচি দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিস্তৃত করার পরিকল্পনা আছে সরকারের। সম্প্রতি *প্রথম আলো* কার্যালয়ে 'সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এসব কথা বলেন।

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন

'ঐক্যবদ্ধ হলে সবে, যক্ষ্মামুক্ত দেশ হবে' –প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ বছর সারাবিশ্বের মতো বাংলাদেশেও ২৪শে মার্চ পালিত হয়েছে 'বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস'। এ উপলক্ষে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান শোভাযাত্রা, আলোচনা অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। **প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন**

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধু স্মরণে বইমেলা

স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে শিশু একাডেমিতে ১৬ই মার্চ থেকে শুরু হয় বইমেলা। এ মেলার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি। অতিথি ছিলেন সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ মুহম্মদ জাফর ইকবাল, সাংসদ কাজী রোজী এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম। সপ্তমবার আয়োজিত এ মেলায় ৫০টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। এ মেলা চলে ২৬শে মার্চ পর্যন্ত।

দিনব্যাপী বঙ্গবন্ধু উৎসব

বঙ্গবন্ধুর ৯৭তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয় ১৭ই মার্চ। এ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় হয় বঙ্গবন্ধু উৎসব।

এ উৎসবের উদ্‌বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি ১৬ই মার্চ ২০১৭ শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বইমেলার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান।

পুতুল নাট্য দিবস উদ্‌যাপিত

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে উদ্‌যাপিত হয় 'বিশ্ব পুতুল নাট্য দিবস'। ২১শে মার্চ আলোচনা সভা, সেমিনার আর পুতুল নাটক মঞ্চায়নের আয়োজন করে শিল্পকলা একাডেমির নাট্যদল ও চলচ্চিত্র বিভাগ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার। **প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা**

ডিজিটাল বাংলাদেশ

প্রযুক্তিনির্ভর হচ্ছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা

অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রযুক্তিনির্ভরতা বাড়ছে। সকল ধরনের অপরাধের রহস্য উদ্‌ঘাটন ও অপরাধী গ্রেফতারের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারে সফলতা আসছে। আর তাই উন্নত দেশের মতো বাংলাদেশেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রায় প্রতিটি বিভাগেই সংযোজন করা হচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। ওয়েবসাইট, ডাটাবেজ, নেটওয়ার্কিং, ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন, কমিউনিকেশন সার্ভার, সিসি ক্যামেরা, সোশাল-মিডিয়া, বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারসহ প্রযুক্তির নানা দিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওয়েব বেজড প্রিজন ভ্যান, ইনসেট ডাটাবেজ, মোবাইল অ্যাপস, অফিস অটোমেশন, ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রসেস, পুলিশ-র‍্যাব ওয়েবসাইট, সিসি টিভি মনিটরিং, ভেহিক্যাল ম্যানেজমেন্ট, সিস্টেম সফটওয়্যার ইত্যাদি পদ্ধতিগুলো দ্বারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সংস্থা দ্রুত ও সঠিকভাবে কাজ করতে পারছে।

বাংলাদেশ যুক্ত হলো দক্ষিণ এশিয়া স্যাটেলাইটে

ভারতের উদ্যোগে তৈরি দক্ষিণ এশিয়া স্যাটেলাইট আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) কার্যালয়ে ২৩শে মার্চ চুক্তিটি সই হয়।

স্যাটেলাইটটি তৈরির সব কার্যক্রম ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহটি উৎক্ষেপণের সমস্ত ব্যয়ভার ভারত সরকার বহন করছে। এটি তৈরিতে খরচ হয়েছে ৪০ কোটি ডলার বা ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকা।

প্রযুক্তি বিষয়ক নারী উদ্যোক্তা তৈরির উদ্যোগ

মাইক্রোসফট ফিলানথ্রসিস-এর প্রকল্পের তালিকায় এবার বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হলো। মাইক্রোসফট ফিলানথ্রসিসের ইয়ুথ স্পার্ক গ্রান্ট পেল বাংলাদেশ। উদ্দেশ্য হলো–দেশের সুবিধাবঞ্চিত নারীদের প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ নারী উদ্যোক্তা গড়ে তোলা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) ও মাইক্রোসফট বাংলাদেশ মিলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ৫ হাজার ২০০টি ডিজিটাল সেন্টারে কাজ করে এমন সব নারী প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে নিয়োজিত আছে। নারীরা যেন পরবর্তীতে উদ্যোক্তা হয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। সেলক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে এটুআই ও মাইক্রোসফট বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হয়েছে শক্তি ফাউন্ডেশন। প্রযুক্তি বিষয়ক উদ্যোক্তা তৈরির এ প্রোগ্রামে নারীদের কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের ব্যবহার , মেরামত ও সমস্যা সমাধানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা রয়েছে। যাতে তারা ছোটো আইটি রিপেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

যশোরে আইটি শিল্পের নতুন দিগন্ত উন্মোচন

যশোরে নির্মিত শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে এসে ১৯শে মার্চ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, শতভাগ কাজ শেষ হলে ১০ হাজার তরুণ-তরুণী এখানে কাজ করার সুযোগ পাবে। যশোর থেকে উন্মোচিত হচ্ছে আইটি শিল্পের নতুন দিগন্ত। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার আয়ের লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে বলে উল্লেখ করেন প্রতিমন্ত্রী।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিচারের উদ্যোগ

দেশে প্রথমবারের মতো ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিচারের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ ব্যবস্থায় আদালতে না নিয়েই কারাগারের ভেতরে রেখেই বন্দির হাজিরা, সাক্ষী ও জবানবন্দি নিয়ে বিচার করা যাবে। আসামিকে কারাগারে রেখেই বিচার কাজ শেষ হবে। অন্যান্য উন্নত দেশের মতো বাংলাদেশেও বিচার ব্যবস্থায় ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে পাইলট প্রকল্প হিসেবে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন পদ্ধতিতে বন্দির বিচারিক কাজ করতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

২রা মার্চ ২০১৭ সিলেটে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিচারিক কার্যক্রম-এর উদ্‌বোধন করেন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক উপস্থিত ছিলেন

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

শস্যের আমদানি কমাতে কোটি টাকার প্রকল্প

দেশের ডাল, তেল ও মসলার চাহিদার প্রায় ৭৫ শতাংশ আমদানি করে পূরণ করা হয়। এতে গুণতে হচ্ছে হাজার কোটি টাকা ।

চাষাবাদে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ভিয়েতনামী সবজি স্কোয়াশ

মানসম্মত বীজ ও আধুনিক চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে এ ঘাটতি পূরণ ও আমদানি কমানো সম্ভব। এলক্ষ্যে প্রায় ২৯১ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। এর মাধ্যমে ১৯টি শস্যের বীজ উৎপাদন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)। ডাল জাতীয় শস্যগুলো হলো– মসুর, মুগ, মাসকলাই, খেসাড়ি, অড়হর, ফেলন। তেলের মধ্যে সরিষা, তিল, সয়াবিন, সূর্যমুখী, চীনা বাদাম। মসলার মধ্যে পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ, মরিচ, আদা, ধনিয়া, কালিজিরা।

উল্লেখ্য, এই প্রকল্পের মাধ্যমে আট বিভাগের ৬৪ জেলার ৪৯০ উপজেলায় কার্যক্রম চালানো হবে। এর মেয়াদকাল থাকবে ২০১৭ সালের জুলাই থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত।

বিটি বেগুনের নতুন জাত উদ্ভাবন

বিটি বেগুনের নতুন ৩টি জাত উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) বিজ্ঞানীরা। এগিয়ে চলছে আরো দুটি স্থানীয় জাতের বিটি জিন অনুপ্রবেশ করিয়ে নতুন দুটি জাত উদ্ভাবনের কাজ।

বর্তমানে দেশে বারি উদ্ভাবিত ৯ জাতের বিটি বেগুনের মধ্যে ৪ জাতের বেগুন চাষ করছেন প্রায় সাড়ে ৫ হাজার কৃষক। বিটি বেগুনের জাতগুলো হাইব্রিড না হওয়ায় কৃষকরা নিজেদের বীজ নিজেরাই উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে পারেন।

২৩শে মার্চ ২০১৭ 'বিটি বেগুনের গবেষণা অগ্রগতি' শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালায় এসব কথা জানান বারির বিজ্ঞানীরা। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আয়োজিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী।

আউশ প্রণোদনা বিতরণ

আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলতি মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে উফশী জাতের আউশ ধানের বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে। ১৪ই মার্চ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ উইং) মোশারফ হোসেন এই কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন। চলতি মৌসুমে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় ২৪০০ জন কিষান-কিষানির মধ্যে উফশী আউশ ধান বীজ, রাসায়নিক সার ও ৪০ জন কৃষকের মধ্যে নেরিকা ধানের বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

জনপ্রিয়তা পাচ্ছে স্কোয়াশ

ক্রমেই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে বিদেশি সবজি স্কোয়াশ। খেতে সুস্বাদু স্কোয়াশ দেখতে অনেকটা লাউ আকৃতির। উচ্চফলনশীল এই সবজি ভাজি, মাছ ও মাংসের সাথে রান্না করে খাওয়া যায়। বিশেষ করে চাইনিজ রেস্টুরেন্টে সবজি এবং সালাদ হিসেবে স্কোয়াশের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা।

স্কোয়াশ লাগানোর ২৫-৩০ দিনের মধ্যে ফুল থেকে সবজি ধরতে শুরু করে। ৪০-৪৫ দিনের মাথায় ক্ষেত থেকে সবজি বাজারে তোলা যায়। রাজধানীর কারওয়ান বাজার ও বাইপাইল সবজি আড়তে পাইকারি মণ প্রতি ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে স্কোয়াশ।

প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী : বিশেষ প্রতিবেদন

কমনওয়েলথ ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড পেলেন উখেংচিং মারমা

কমনওয়েলথ ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড পেলেন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার উখেংচিং মারমা। ১৫ই মার্চ লন্ডনে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ১৩টি দেশ থেকে পুরস্কার পেয়েছেন মোট ১৭ জন। উখেংচিং মারমা বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মেয়েদের মধ্যে মাসিককালীন স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি এরই মধ্যে ৭০০ মেয়ের মধ্যে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি করেছেন। উখেংচিং মারমা ছাড়াও আরো এক বাংলাদেশি পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি হলেন তৌফিক আহমদ, একজন সামাজিক উদ্যোক্তা। গঠন করেছেন সাউথ এশিয়ান সোসাইটি নামের একটি সংগঠন। তিনি 'গার্লস ফর গ্লোবাল গোলস' কর্মসূচি পরিচালনা করছেন এবং এর মাধ্যমে ৬০০ তরুণী জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন।

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জন্য আলাদা ভূমি কমিশন আইন

সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে পৃথক ভূমি কমিশন আইন প্রণয়নের কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। এ আলোকে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভূমি কমিশন আইন, ২০১৫-এর খসড়া তৈরি হয়েছে। তা দ্রুত সংসদে তোলার দাবি জানিয়েছে ইন্ডিজেনাস পিপলস ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (আইপিডিএস)। সম্প্রতি *দ্য ডেইলি স্টার* ভবনের সম্মেলন কক্ষে আইপিডিএস ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর যৌথ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ দাবি জানানো হয়।

আইএলও'র কর্মশালা

'বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত কোটা পদ্ধতির নীতি' শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় সম্প্রতি রাজধানীর একটি হোটেলে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই কর্মশালার আয়োজন

করে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, বিসিএস-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় মেধাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তিনি পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার সুযোগ আরো প্রসারিত করার ওপর গুরুত্ব দেন।

প্রতিবেদন: মো. জাকির হোসেন

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

শিশুদের দেশপ্রেমী ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

শিশুকাল থেকেই দেশপ্রেমের শিক্ষা নিয়ে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিশুদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'আমাদের ছেলেমেয়েদের ভেতর একটি আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে। জাতির পিতা শিশুকাল থেকেই যেমন নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন দেশ ও জনগণের কল্যাণে, ঠিক সেভাবেই শিশুদের গড়ে তুলতে হবে'।

১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৭তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে শিশু সমাবেশ, আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বাংলাদেশের ৬০ লাখ যুবককে উদ্যোগী করার কর্মসূচি নিয়েছেন কৈলাস সত্যার্থী

বিশ্বের অধিকারবঞ্চিত ১০ কোটি শিশুর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজে নেমেছেন ভারতের নোবেলজয়ী শিশু অধিকারকর্মী কৈলাস সত্যার্থী। বাংলাদেশ থেকে ৬০ লাখ যুবককে উদ্যোগী করার কর্মসূচিতে যাত্রাও শুরু করেছেন তিনি। বাংলাদেশে তার কর্মসূচির সমন্বয়কারী গণস্বাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী।

তরুণদের অফুরান প্রাণশক্তিকে সঠিক দিকে প্রবাহিত করতে না

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই মার্চ ২০১৭ টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৭তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বইমেলা উদ্‌বোধন শেষে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন –পিআইডি

পারার কারণেই তারা উগ্রবাদের খপ্পরে পড়ছে বলে মনে করেন কৈলাস সত্যার্থী। ৪ঠা এপ্রিল জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, আমরা তারুণ্যের শক্তিতে ভরসা রাখি। এই তারুণ্য কেবল শক্তি আর উদ্যমেই ভরা নয়, তাদের মধ্যে রয়েছে আদর্শিকতার শক্তিশালী উপাদান। তাদের স্বপ্ন আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, তারা নিজেদের প্রকাশ করতে চায়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা তাদের জন্য কোনো বৈশ্বিক প্লাটফরম দিতে পারিনি, যেখানে তারা নিজেদের প্রকাশ ঘটাতে পারবে। **প্রতিবেদন : নাসিমা খাতুন**

ইতিহাস ও ঐতিহ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

ঐতিহাসিক পানাম নগর

অতি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক একটি জনপদ সোনারগাঁ। ঐতিহাসিক এই জনপদের বর্ণাঢ্য সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পানাম নগর। ফারসি ভাষা থেকে এসেছে পানাম শব্দটি। এর অর্থ আশ্রয়স্থল। অনাদর আর অবহেলার চিহ্ন গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া এই নগরের ধ্বংসাবশেষগুলো। সোনালি অতীতের সাক্ষী এই নগর এখনো সৌন্দর্যপিপাসু মানুষগুলোকে আকর্ষণ করে।

পৃথিবীর ১০০টি ধ্বংসপ্রায় ঐতিহাসিক শহরের একটি পানাম নগর। ঈসা খাঁর আমলের বাংলার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই মার্চ ২০১৭ টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৭তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে শিশু সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

রাজধানী পানাম নগর । বড়ো নগর, খাস নগর, পানাম নগর– প্রাচীন সোনারগাঁর এই তিন নগরের মধ্যে পানাম ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়।

ঢাকার ২৭ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে নারায়ণগঞ্জের খুব কাছে সোনারগাঁয়ে অবস্থিত এই নগর। সোনারগাঁ লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর থেকে উত্তর দিকে হাঁটাপথেই পৌঁছানো যায় অর্ধ চন্দ্রাকৃতি পানাম পুলে। এই পুল পেরিয়েই পানাম নগর এবং নগরী চিরে চলে যাওয়া পানাম সড়ক। সড়কের দুপাশে সারি সারি আবাসিক একতলা ও দ্বিতল বাড়িতে ভরপুর পানাম নগর।

পানাম নগরের বিক্ষিপ্ত নিদর্শনাদি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটি পূর্বে মেঘনা, পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা, দক্ষিণে ধলেশ্বরী ও উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা বেষ্টিত একটি বিস্মৃত জনপদ ছিল। এখানে কয়েক শতাব্দী পুরনো অনেক ভবন রয়েছে, যা বাংলার বারো ভূইঁয়াদের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত। সোনারগাঁয়ের ২০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে এই নগরী গড়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক পানাম নগর, সোনারগাঁ

১৪০০ শতাব্দীতে এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে পৃথিবীর নামিদামি শিক্ষকরা পড়াতে আসতেন। ১৫ শতকে ঈসা খাঁ বাংলার প্রথম রাজধানী স্থাপন করেছিলেন সোনারগাঁয়ে।

১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে মোগলদের সোনারগাঁ অধিকারের পর সড়ক ও সেতু নির্মাণের ফলে রাজধানী শহরের সাথে পানাম এলাকার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পানামের টিকে থাকা বাড়িগুলোর মধ্যে ৫২টি বাড়ি উল্লেখযোগ্য। ইটের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে ঢালাই-লোহার তৈরি ব্র্যাকেট, ভেন্টিলেটর আর জানালার গ্রিল। মেঝেতে রয়েছে লাল, সাদা, কালো মোজাইকের কারুকাজ। পানাম নগরীর পরিকল্পনাও নিখুঁত। নগরীর পানি সরবাহের জন্য দুপাশে ২টি খাল ও ৫টি পুকুর আছে। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই আছে কুয়া বা কূপ।

নগরীর ভিতরে আবাসিক ভবন ছাড়াও আছে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, মঠ, গোসলখানা, নাচঘর, পান্থশালা, চিত্রশালা, খাজাঞ্চিখানা, দরবার কক্ষ, গুপ্ত পথ, বিচারালয়, পুরনো জাদুঘর। এছাড়া আছে ৪০০ বছরের পুরনো টাকশাল বাড়ি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নীল চাষের নির্মম ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে পানামের নীলকুঠি। পানাম পুলের কাছে দুলালপুর সড়কের পাশেই এর অবস্থান। **প্রতিবেদন : সোহেল বীর**

বিশ্ব আবহাওয়া দিবস

বিশ্ব আবহাওয়া দিবস ২৩শে মার্চ। এবারের প্রতিপাদ্য– 'মেঘের গমনাগমন' (আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লাউড)'। আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস মেঘের ওপর নির্ভরশীল। আবহাওয়া, জলবায়ু ও পানি ব্যবস্থায় মেঘের গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও সতর্কতায় মূল ভূমিকা পালন করে মেঘ। বিশ্বের পানিচক্র ও সমস্ত জলবায়ু ব্যবস্থায় মেঘের অবদান অনস্বীকার্য। পৃথিবীর শক্তির ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে মেঘ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই মেঘের গমনাগমন পর্যবেক্ষণ করতে সার্বক্ষণিক ডপলার ওয়েদার রাডার চালু রাখা জরুরি বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞগণ।

বিরূপ জলবায়ুর কারণে কম বয়সেই মা হচ্ছে ইলিশ

আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশের প্রজননের সময় বছরে তিনবার। ফেব্রুয়ারি-মার্চ, জুন-জুলাই ও অক্টোবর-নভেম্বর। জুন থেকে নভেম্বরে বড়ো ইলিশ ডিম ছাড়ে। নোনা পানির এ মাছটি ডিম ছাড়তে নদীর উজান বেয়ে উঠে আসে মিঠা পানিতে। ডিম ছাড়া হলে ভাটিতে ভাসে সাগরের পথে। ডিম ফুটে মাছ হওয়া জাটকাও ছোটে সাগরের দিকে। জীবনচক্র পূর্ণ করে ডিম ছাড়ার সময় ফের আসে নদীর অগভীর পানিতে। ঘন্টায় সর্বোচ্চ ৭১ কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে ইলিশ। ডিম ছাড়তে মাছটি ১২শ কিলোমিটার সাঁতরায়। তবে বেশি গভীরতায় সাঁতরাতে সুবিধা হয়। সাঁতরাতে সাঁতরাতেই মাছটি ডিম ছাড়ে। একেকটি মা ইলিশ ডিম ছাড়ে ২০ লক্ষ পর্যন্ত। অক্টোবরেই সবচেয়ে বেশি ডিম ছাড়ে ইলিশ। এ মাছ সাধারণত ৬০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। বড়ো ইলিশের ওজন হয় আড়াই কেজি পর্যন্ত। পুরুষের চেয়ে আকারে বড়ো হয় স্ত্রী ইলিশ, বাড়েও দ্রুত। বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী জিডিপিতে ইলিশের অবদান ১ শতাংশ। দেশে মাছের মোট চাহিদার ১১ শতাংশ ইলিশ থেকে পূরণ হয়। এই ইলিশ মাছই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দিন দিন হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। আবহাওয়াজনিত কারণে কম বয়সেই মা হচ্ছে ইলিশ। মাত্র একশ গ্রাম ওজনের ইলিশেও মিলছে পেটভর্তি ডিম। সাধারণত ডিম ধারণের জন্য পরিপক্ক হতে ১টি ইলিশের বয়স কমপক্ষে এক বছর হতে হয়। অথচ এখন পাঁচ থেকে সাত মাস বয়সি ইলিশের পেটেও ডিম মিলছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে টিকে থাকতে ইলিশ তার প্রজনন ও জীবনচক্র পালটাচ্ছে। ইলিশের এই অল্প বয়সে মা হওয়াকে গবেষকরা হুমকি বলে মনে করছেন।

প্রতিবেদন : আছাব আহমেদ

বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস

'নারী-পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা, বদলে যাবে বিশ্ব, কর্মে নতুন মাত্রা' –স্লোগানকে সামনে রেখে সভা, সমাবেশ, শোভাযাত্রাসহ বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে সারাদেশে বিপুল উৎসবে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি ৮ই মার্চ ২০১৭ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

দিবসটি উপলক্ষে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজন করে নারী সমাবেশের। সেখানে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে পাঁচজন নারীকে জয়িতা পদক দেওয়া হয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মিলনায়তনে 'শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা প্রদান' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের নিজস্ব মিলনায়তনে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করে। 'নারীর জন্য নিরাপদ ঢাকা' স্লোগানে নারীদের অংশগ্রহণে ১০ কিলোমিটারের দীর্ঘ ম্যারাথন আয়োজন করে এভারেস্ট একাডেমি এবং ইমাগো স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড।

রাজধানী ছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন, শোভাযাত্রা, সাইকেল শোভাযাত্রা ও পুরুষ সমাবেশেরও আয়োজন করা হয়।

নারী ও শিশু হেল্পলাইন নম্বর এখন ১০৯

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে চালু থাকা হেল্পলাইন নম্বর ১০৯২১ পরিবর্তন করে নতুন নম্বর ১০৯ করা হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে রাজধানীতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ নম্বর পরিবর্তনের ঘোষণা দেওয়া হয়। নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু যে-কোনো মোবাইল ও অন্যান্য ফোন থেকে সরাসরি বিনা খরচে ১০৯ নম্বরে ফোন করে ২৪ ঘণ্টা সহায়তা নিতে পারবেন।

'বিজনেস ফর পিস অ্যাওয়ার্ড' পেলেন ডুরীন শাহনাজ

সম্মানজনক 'অসলো বিজনেস ফর পিস অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন বাংলাদেশের মেয়ে ডুরীন শাহনাজ। ২৮শে মার্চ নরওয়ের রাজধানী অসলো সিটি হল থেকে এ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। বিজনেস ফর পিস ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে দেওয়া এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সিঙ্গাপুরভিত্তিক সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট এক্সচেঞ্জ'-এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন ডুরীন শাহনাজ। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বব্যাপী কাজ করে থাকে। ব্যবসার সঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধের সমন্বয়ের মাধ্যমে শান্তি ও স্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে ।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ওয়াই-ফাই

তথ্যপ্রযুক্তিতে নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের জন্য তাদের ওয়াই-ফাই সুবিধা প্রদান করতে যাচ্ছে সরকার। ১৪ই মার্চ উইমেন আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিশিয়েটিভ (ওয়াই-ফাই) বাংলাদেশ-এর প্রাক উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, আমরা এ উদ্যোগের মাধ্যমে ২০১৮ সালের মধ্যে ৩০ হাজারের বেশি নারী উদ্যোক্তা গড়ে তুলতে পারব।

হংকং-এ প্রথম নারী প্রধান নির্বাহী

চীনের হংকং এই প্রথমবারের মতো প্রধান নির্বাহী হিসেবে একজন নারীকে পেয়েছে। নাম ক্যারি লাম। তিনি ২৬শে মার্চ অনুষ্ঠিত ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন।

হংকংয়ের প্রধান নির্বাহী নির্বাচনে জনগণের সরাসরি ভোটের ব্যবস্থা নেই। চীনপন্থি এক হাজার ২০০ জনের একটি কমিটি এই ভোটাভুটি সম্পন্ন করে থাকে।

১৪ই মার্চ ২০১৭ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল -এর উদ্যোগে আয়োজিত উইমেন আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিশিয়েটিভ (ওয়াই-ফাই) বাংলাদেশ-এর প্রাক উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক

৮১ বছর বয়সি এক নারী বানালেন অ্যাপ

৮১ বছর বয়সি জাপানি এক নারী স্মার্টফোন অ্যাপ বানিয়ে বিশ্ববাসীকে রীতিমতো চমকে দিয়েছেন। নাম মাসাকো ওয়াকামিয়া। সম্প্রতি টেডএক্স সম্মেলনে এবং মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএনকে দেওয়া তার এক সাক্ষাৎকারে এ সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে। মাসাকো মূলত অ্যাপেলের আইওএস-এর জন্য একটি গেম তৈরি করেছেন। তিনি জাপানের ঐতিহ্যবাহী উৎসব হিনামাৎসুরিকে নিয়ে তৈরি এ গেমের নাম দিয়েছেন হিনাদান।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

স্বাভাবিক প্রসবের হার বাড়ানোর উদ্যোগ

প্রসূতি মৃত্যুহার কমাতে সরকার দেশের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোয় স্বাভাবিক প্রসবের হার বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। বিষয়টি বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন চারটি কর্মসূচি আটটি বিভাগে বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

চলমান স্বাস্থ্য সেক্টর (২০১৭-২২) কর্মসূচিতে জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাভাবিক প্রসবের হার বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাভাবিক প্রসবের সংখ্যা বৃদ্ধি একটি সূচক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দেশের জেলা-উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে সম্প্রতি পর্যাপ্ত সংখ্যক নার্স পদায়ন করা হয়েছে। পদায়নকৃত নার্সদের মাধ্যমে এএনসি, পিএনসি'র মাধমে স্বাভাবিক প্রসব নিশ্চিত করতে স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং কার্যক্রমের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়রা যেন প্রসবকালীন সেবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে গ্রহণ করেন, সেজন্য তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

মহিলা সিটে পুরুষ বসলে জেল-জরিমানা

সড়ক পরিবহণ আইন ২০১৭-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

সারাদেশে গণপরিবহণে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখার বিধান থাকলেও এর সুফল সংশ্লিষ্টরা পাচ্ছেন না। এ কারণে গণপরিবহণে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের আসন নিশ্চিত করতে সড়ক পরিবহণ আইন ২০১৭-এর খসড়ায় কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। এ আইনে বলা হয়েছে– নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে তাদের বসতে না দিয়ে অন্য কেউ ওই আসনে বসলে তাকে এক মাসের কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

প্রতিবেদন : সানজিদা আহমেদ

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল

বিরল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে রেলপথে আবার শুরু হলো পণ্য আমদানি-রপ্তানি। প্রায় একযুগ আগে এই রেলপথ চালু ছিল। এই রেলপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে একদিকে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে অন্যদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। দিনাজপুর অঞ্চলের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখবে।

ভারত, নেপাল, ভুটান এবং মিয়ানমার রেলপথে বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহণের চুক্তি অনুযায়ী বিরল সীমান্ত দিয়ে ডুয়েল গেজ

বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার বিরল এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার রাধিকাপুরের মধ্যে ডুয়েলগেজ রেলপথে ৮ই এপ্রিল ২০১৭ পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়

রেলপথে প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলকভাবে ভারতীয় পাথরবাহী একটি ট্রেন ৮ই মার্চ বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ২০০৪ সাল পর্যন্ত মিটার গেজ রেলপথে নেপাল, ভারত এবং মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের মধ্যে সীমিত সংখ্যক পণ্যবাহী ট্রেন বিরল রেলপথ দিয়ে চলাচল করত। পরীক্ষামূলকভাবে পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ায় উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা দেখছেন স্থানীয় জনগণ ও ব্যবসায়ীরা। **প্রতিবেদন : জাহিদ হোসেন নিপু**

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কে আর যানজট হবে না

ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানজট নিরসনে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কের অতি গুরুত্বপূর্ণ তিনটি সেতুর নির্মাণ কাজ। প্রায় নয় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে এই তিনটি সেতুর নির্মাণ কাজ হচ্ছে শীতলক্ষ্যা, মেঘনা এবং মেঘনা-গোমতী নদীর ওপর। বিদ্যমান সেতুর পাশেই নির্মাণ করা হচ্ছে সেতুগুলো। আশা করা হচ্ছে, ২০১৯ সালের জানুয়ারিতেই সেতু তিনটি একযোগে খুলে দেওয়া হবে যানবাহন চলাচলের জন্য। এতে করে ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানজটের অবসান হবে।

ফিটনেসবিহীন গণপরিবহণ বন্ধে অভিযান

২০ বছরের বেশি পুরনো ও মেয়াদোত্তীর্ণ গণপরিবহণ চলাচল বন্ধে রাজধানীর পৃথক পৃথক তিনটি স্থানে একযোগে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। নগরীর যানজট কমাতে এ উদ্যোগ নেয় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ), ঢাকা জেলা প্রশাসন , ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) ও ডিএসসিসি'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা এই আদালত পরিচালনা করেন।

নিরাপত্তা স্থাপনা সরিয়ে নিয়েছে মার্কিন দূতাবাস

বারিধারায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের সামনে ফুটপাতের ওপরে থাকা নিরাপত্তা স্থাপনা ৩রা মার্চ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাতে করে ফুটপাতটি দিয়ে জনসাধারণ নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারছে।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

পাট দিবস ও বহুমুখী পাট পণ্য মেলা

শিল্প-বাণিজ্যে পাটখাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে সারাদেশে প্রথমবারের মতো পালিত হলো জাতীয় পাট দিবস-২০১৭। 'সোনালি আঁশের সোনার দেশ, পাট পণ্যের বাংলাদেশ' –স্লোগান নিয়ে গত ৬ই মার্চ এ দিবস পালিত হয়। রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে এ দিবস উপলক্ষে ৯ থেকে ১৩ই মার্চ পাঁচ দিনব্যাপী

বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী মুহা. ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক ৬ই মার্চ ২০১৭ জাতীয় সংসদ ভবন প্রাঙ্গণে বেলুন উড়িয়ে প্রথম 'জাতীয় পাট দিবস ২০১৭' উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি

'বহুমুখী পাট পণ্য মেলা ২০১৭' আয়োজন করা হয়। মেলায় বাহারি ও দৃষ্টিনন্দন পাট পণ্যের সমাহার দর্শনার্থী ও ক্রেতাদের মুগ্ধ করে। আয়োজিত হওয়া এ মেলায় প্রায় ৩ কোটি ৬৫ লাখ টাকার পাটজাত পণ্যের বাণিজ্য হয়েছে এবং ৪ কোটি ১২ লাখ টাকার পাটজাত পণ্য সরবরাহের অর্ডার পাওয়া গেছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জিডিপিসি) এ মেলার আয়োজন করে।

শিল্পের প্রসারে আলাদা আলাদা শিল্পপার্ক স্থাপনের উদ্যোগ

দেশের বিকাশমান শিল্পকারখানা প্রসারের জন্য আলাদা আলাদা শিল্পপার্ক গড়ে তোলা হবে। বিচ্ছিন্নভাবে শিল্পকারখানা স্থাপন করলে গ্যাস-বিদ্যুৎসহ নানা সংযোগ দিতে ঝামেলা হয়। একীভূত থাকলে গ্যাস-বিদ্যুৎসহ সব ধরনের প্রয়োজন দ্রুত মেটানো যায়। ১৬ই মার্চ নারায়ণগঞ্জে বিকেএমইএ ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক মতবিনিময় সভায় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এসব কথা বলেন।

মাছ রপ্তানিতে আট মাসে আয় ২৮৩৫ কোটি টাকা

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি মেয়াদে হিমায়িত ও জীবিত মাছ রপ্তানিতে আয় হয়েছে ৩৫ কোটি ৭৯ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার বা ২ হাজার ৮৩৫ কোটি টাকা। অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে শুধু চিংড়ি রপ্তানিতে আয় হয়েছে ৩০ কোটি ৫৭ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার বা ২৪২১ কোটি টাকা, যা এ সময়ের হিমায়িত ও জীবিত মাছ রপ্তানি আয়ের ৮৫ দশমিক ৪১ শতাংশ। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) মার্চ মাসে প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

পর্যটন : বিশেষ প্রতিবেদন

মোহনীয় ডিসি ইকোপার্ক চুয়াডাঙ্গা

আমাদের দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তঘেঁষা ক্ষুদ্রতম জনপদ চুয়াডাঙ্গা। শিবনগর এই জনপদেরই ছোট্ট একটি গ্রাম। ভৌগোলিক অবস্থান বিচারে এ গ্রামটি দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের সীমানাভুক্ত। দূর থেকে দেখলে পুরো গ্রামটিকেই মনে হবে একটি অরণ্য। চারদিকে সবুজ ক্ষেতখামার আর গাছগাছালির সমারোহ। এর মধ্যেই আছে জনবসতি, আছে কোলাহল– জীবনের স্পন্দন। অবশ্য কখনো কখনো পাখির কলকাকলিতে হারিয়ে যায় মানুষের এই কোলাহল। এ যেন পাখিদেরই রাজ্য। মানুষ এখানে যাযাবর।

শিবনগর গ্রামে প্রবেশের প্রধান যে রাস্তা তার দুধারে সুউচ্চ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সারিবদ্ধ অনেকগুলো তালগাছ। এ তালগাছগুলোর দিকে একঝলক তাকালে কারোই বোধহয় অনুমান করতে কষ্ট হবে না– এরা বহু বছর ধরে এভাবেই অপেক্ষমান। সাথে সাথে এটাও অনুমান করা যায়, কোনো সৌন্দর্যবিলাসী মানুষের সংস্পর্শেই এদের বেড়ে ওঠা। এ তালগাছগুলোর সৌন্দর্যে চোখ জুড়িয়ে যায়, মন আবিষ্ট হয় অন্যরকম ভালোলাগায়। সুদক্ষ শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবিও যেন এদের সৌন্দর্যের কাছে হার মানে। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে এ স্থানের সাদামাটা নাম 'তালসারি'।

এ তালসারির দুপাশে রয়েছে বাগান। এ বাগানে আম গাছই সংখ্যাধিক্য। অন্য প্রজাতির কিছু গাছপালাও রয়েছে। বাগানের সীমান্তে রয়েছে একটি বিরাট জলাশয়, দেখতে অনেকটা বিলের মতো। নাম বটতলী বিল। বাগান আর জলাশয় মিলিয়ে আয়তন প্রায় ১২৮.২৩ একর। সমগ্র জায়গাটিই সরকারি সায়রাতভুক্ত।

ব্রিটিশ শাসনামলে চুয়াডাঙ্গা জেলা নদীয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলার দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশের জাতক শ্রী নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী

ডিসি ইকোপার্ক চুয়াডাঙ্গার প্রবেশপথ

ডিসি ইকোপার্ক চুয়াডাঙ্গার তালসারি

ছিলেন এ রাজ্যের জমিদার। শিবনগর সংলগ্ন নাটুদহ গ্রামে ছিল তার বসবাস। ১৮৮৩ সালের দিকে জমিদার শ্রী নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী বটতলী বিল সংলগ্ন শিবনগর এলাকায় তার জমিদারভুক্ত বিশাল এলাকাজুড়ে আম, কাঁঠাল ও লিচুর বাগান সৃজন করেন। এ বাগানের প্রবেশপথের দুধারে সারিবদ্ধভাবে রোপণ করেন তালগাছ। দেশবিভাগের পর শ্রী নফরচন্দ্র পাল চৌধুরীর এই আম বাগান, কাঁঠাল বাগান, লিচু বাগান, তালসারি ও বটতলী বিল সরকারি মালিকানায় আসে। বহু বছর যাবৎ পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বাগানটির অনেক গাছপালা মারা যায়, বাগান হয়ে পড়ে শ্রীহীন। বহু জমি বেহাত হয়ে যায়। এক সময় সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয় এই অরণ্য।

সময়ের পরিক্রমায় ২০১৪ সালে আম বাগান ও সংলগ্ন জলাশয় নিয়ে ইকোপার্ক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পার্কের নাম নির্ধারণ করা হয় 'ডিসি ইকোপার্ক'। খুলনা বিভাগীয় কমিশনার জনাব মো. আব্দুস সামাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন এই ইকোপার্ক গড়ে তোলার কাজে হাত দেয়। দামুড়হুদা উপজেলার তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো. ফরিদুর রহমান এটিকে 'উদ্ভাবনী' উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করেন। আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বিনোদনের জায়গা করে রেখে যাওয়া ও সরকারের স্থায়ী প্রকৃতির সম্পদ সৃষ্টি করাই এ উদ্ভাবনী উদ্যোগের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা হয়।

শুরু হয় মৃতপ্রায় একটি বাগানকে ইকোপার্কে রূপান্তরের কর্মযজ্ঞ। প্রাথমিক অবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আগাছা ও জঙ্গল পরিষ্কার করেন। তারপর ইকোপার্কের শ্রী বৃদ্ধির দিকে নজর দেন। বৃক্ষশূন্য স্থানে রোপণ করা হয় বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা। ইতোমধ্যে এ পার্কের চৌহদ্দিতে রোপণ করা হয়েছে ৯৯ প্রজাতির প্রায় ১২,০০০টি গাছ। চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সহযোগিতায় ঔষধি গুণসম্পন্ন নানা প্রজাতির উদ্ভিদের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয়েছে 'ভেষজ কর্নার'। মানুষ ও জীবজন্তুর অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে লেকের পাড় বাদ রেখে বাকি সীমানাজুড়ে নির্মিত হয়েছে কাঁটাতারের বেড়া। মূল বাগানের প্রবেশমুখে নির্মাণ করা হয়েছে গেট। এ গেট দিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে বামদিকে তাকালেই চোখে পড়ে একটি সুউচ্চ গ্রীবাবিশিষ্ট জিরাফের মূর্তি। পরিচিত কিছু পশুপাখির মূর্তি দিয়ে সাজানো হয়েছে একটি কর্নার। ইকোপার্ক গড়ে তোলার সূচনালগ্নেই এখানে নির্মিত হয় বিশ্রামাগার। পরিশ্রান্ত দর্শনার্থীদের জন্য বাগানের বিভিন্ন স্থানে তৈরি করা হয়েছে বৈচিত্র্যময় সব বসার স্থান। দর্শনার্থীদের মলমূত্র ত্যাগের জন্যও রয়েছে সুবন্দোবস্ত। সম্প্রতি চালু হয়েছে 'ইকোপার্ক ক্যাফে' নামে একটি খাবারের দোকান। বাগানের ভেতরে গমনাগমন পথের দুধারে রোপণ করা হয়েছে নানা প্রজাতির বাহারি সব ফুলের গাছ।

ইকোপার্ক সংলগ্ন বটতলী বিল পার্কের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণে। এ বিল দর্শনার্থীদের জন্য এক বাড়তি আকর্ষণ। এ বিলের পূর্ব পাড়ে দর্শনার্থীদের জন্য রয়েছে একটি ছাউনি। এ ছাউনি থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে বিলের স্বচ্ছ জলে। বিলে রয়েছে ইঞ্জিনচালিত নৌকা। ইচ্ছে করলেই স্বল্প খরচেই মেটানো যায় নৌকায় চড়ে ভেসে বেড়ানোর শখ। সব মিলিয়ে এ পার্ক যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরূপ। নানা প্রজাতির শতবর্ষী গাছপালা ও পাখির কলতানে সদা মুখরিত। ইতোমধ্যেই এ পার্কের সৌন্দর্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এ পার্কের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসতে শুরু করেছে সৌন্দর্যবিলাসী ভ্রমণপিপাসু মানুষ। যারাই এ পার্কে এসেছেন তারাই বিমোহিত হয়েছেন। আশা করা হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে এই ডিসি ইকোপার্ক দেশের অন্যতম সেরা ইকোপার্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

প্রতিবেদন : মো. আবুবকর সিদ্দীক

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

বোধিসত্ত্ব আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত বাংলাদেশের ৩টি ছবি

ভারতের বিহার রাজ্যের পাটনা শহরে অনুষ্ঠিত বোধিসত্ত্ব আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছে বাংলাদেশের ৩টি ছবি। উৎসবে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় স্বল্পদৈর্ঘ্য বিভাগে তাসমিয়া আফরিন মৌ পরিচালিত *কবি স্বামীর মৃত্যুর পর আমার জবানবন্দি* সিলভার বোধিসত্ত্ব অ্যাওয়ার্ড ও খন্দকার সুমন পরিচালিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *পৌনঃপুনিক* বোধিসত্ত্ব স্পেশাল জুরি মেনশন অ্যাওয়ার্ড এবং প্রামাণ্যচিত্র বিভাগে শবনম ফেরদৌসীর *জন্মসাথী* বোধিসত্ত্ব স্পেশাল জুরি মেনশন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। ১৬ থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ উৎসবে বাংলাদেশ থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত তিনটি চলচ্চিত্র ছাড়াও পূর্ণদৈর্ঘ্য বিভাগে রুবাইয়াৎ হোসেনের *আন্ডার কনস্ট্রাকশন* এবং এলিয়ান

মাই বাইসাইকেল চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য

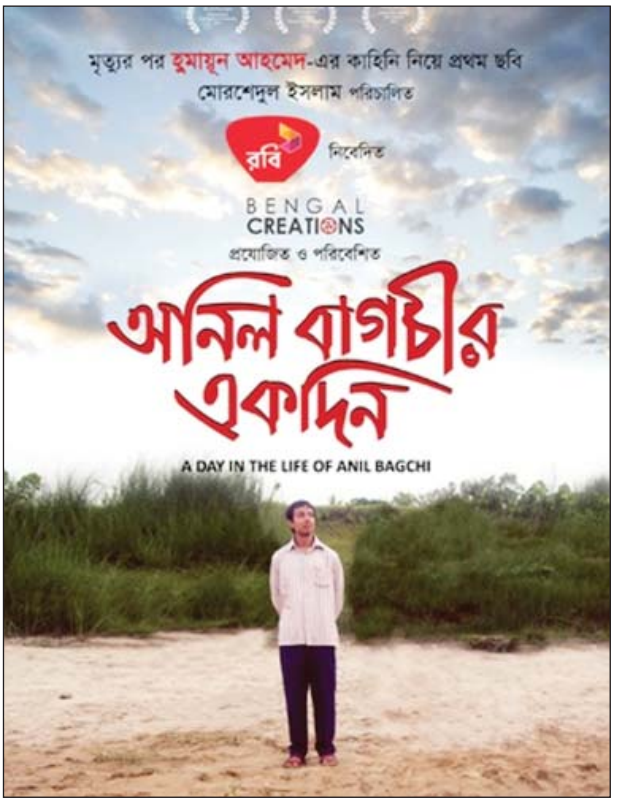

ভিসতা বিভাগে অং রাখাইনের *মাই বাইসাইকেল* মনোনয়ন পেয়েছে। উৎসবে জুরি বোর্ডের প্রধান ছিলেন ভারতের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক গোবিন্দ নিহালানী।

কলকাতায় বাংলাদেশের ১০টি ছবি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কলকাতার নন্দন মিলনায়তনে আয়োজিত হয়েছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নিয়ে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব'। ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইন্ডিয়া (পূর্বাঞ্চল) ও নন্দন যৌথভাবে এ উৎসবের আয়োজন করে।

২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করা হয়। চার দিনব্যাপী উৎসবে দেখানো হয় বাংলাদেশের ১০টি ছবি। উৎসবের প্রথম দিন দেখানো হয় আবু সাইয়ীদের *কিত্তনখোলা* ও মোরশেদুল ইসলামের *অনিল বাগচীর একদিন*, দ্বিতীয় দিন আবু শাহেদ ইমনের *জালালের গল্প* ও মোরশেদুল ইসলামের *আমার বন্ধু রাশেদ*, তৃতীয় দিন আহসান কবির লিটনের *প্রত্যাবর্তন* ও অমিতাভ রেজা চৌধুরীর *আয়নাবাজি* এবং *শেষ দিন* অর্থাৎ ২৪শে ফেব্রুয়ারি দেখানো হয় শবনম ফেরদৌসীর *ভাষাজয়ীতা*, খন্দকার সুমনের *পৌনঃপুনিক*, তাসমিয়া আফরিনের *কবি স্বামীর মৃত্যুর পর আমার জবানবন্দি* ও নুরুল আলম আতিকের *ডুব সাঁতার*।

কানাডার দক্ষিণ এশীয় চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের ৩ ছবি

কানাডাভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল অব সাউথ এশিয়ায় (আইএফএফএসএ) আমন্ত্রণ পেয়েছে বাংলাদেশের ৩টি ছবি– *ভুবন মাঝি*, *মাটির প্রজার দেশে* ও *লাইভ ফ্রম ঢাকা*। এ উৎসবে দক্ষিণ এশিয়ার ৪০টি ছবি প্রদর্শনের কথা রয়েছে। কানাডার টরন্টোতে আয়োজিত এ উৎসবের পর্দা উঠবে আগামী ১১ই মে । চলবে ২২শে মে পর্যন্ত । **প্রতিবেদন: মিতা খান**

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

শততম টেস্টে টাইগারদের অবিস্মরণীয় বিজয়

১৯শে মার্চ কলম্বোর সি সারা ওভালে শততম টেস্ট ম্যাচ চার উইকেটে জিতে নিল টাইগার বাহিনী। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে বাংলাদেশ পেল দুর্লভ জয়। দেশের বাইরে চতুর্থ এবং সব মিলিয়ে এটি নবম জয়। শততম টেস্ট জয়ের কৃতিত্ব নেই ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো ক্রিকেট পরাশক্তির। তাই আমাদের এ বিজয়টা ঐতিহাসিক। দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ১-১ এ ড্র হয়।

শততম টেস্টে টাইগারদের অবিস্মরণীয় বিজয়োল্লাস

শততম টেস্টে স্মরণীয় জয়ের জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। এ বিজয় বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে একটি মাইলফলক।

শততম টেস্টে সাকিবের বিশ্ব রেকর্ড

বাংলাদেশের শততম টেস্টে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে অল রাউন্ডার সাকিব আল হাসান। শততম টেস্টে ব্যাট হাতে সেঞ্চুরি, বল হাতে ৪ উইকেট নিয়েছেন তিনি। দুই ম্যাচে ১৬২ রান ও ৯ উইকেট নিয়ে সিরিজ সেরার পুরস্কার জিতে নেন এই বিশ্বসেরা অল রাউন্ডার।

প্রতিবেদন : জাকির হোসেন চৌধুরী

নবারুণ

নিয়মিত পড়বে
লেখা ও মতামত পাঠাবে

লেখা সিডি অথবা
ই-মেইলে পাঠান
email : nbdfp@yahoo.com

নবারুণ-এর বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা ।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd. No. Dha-476 Sachitra Bangladesh vol. 37, No. 10, April 2017, Tk. 25.00

বৈশাখি মেলায় মাটির বর্ণিল তৈজসপত্রের পসরা

সচিত্র বাংলাদেশ
এপ্রিল ২০১৭ ■ চৈত্র ১৪২৩-বৈশাখ ১৪২৪

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা